অগ্রহায়ণ ১৩৮৫

আনন্দমেলা

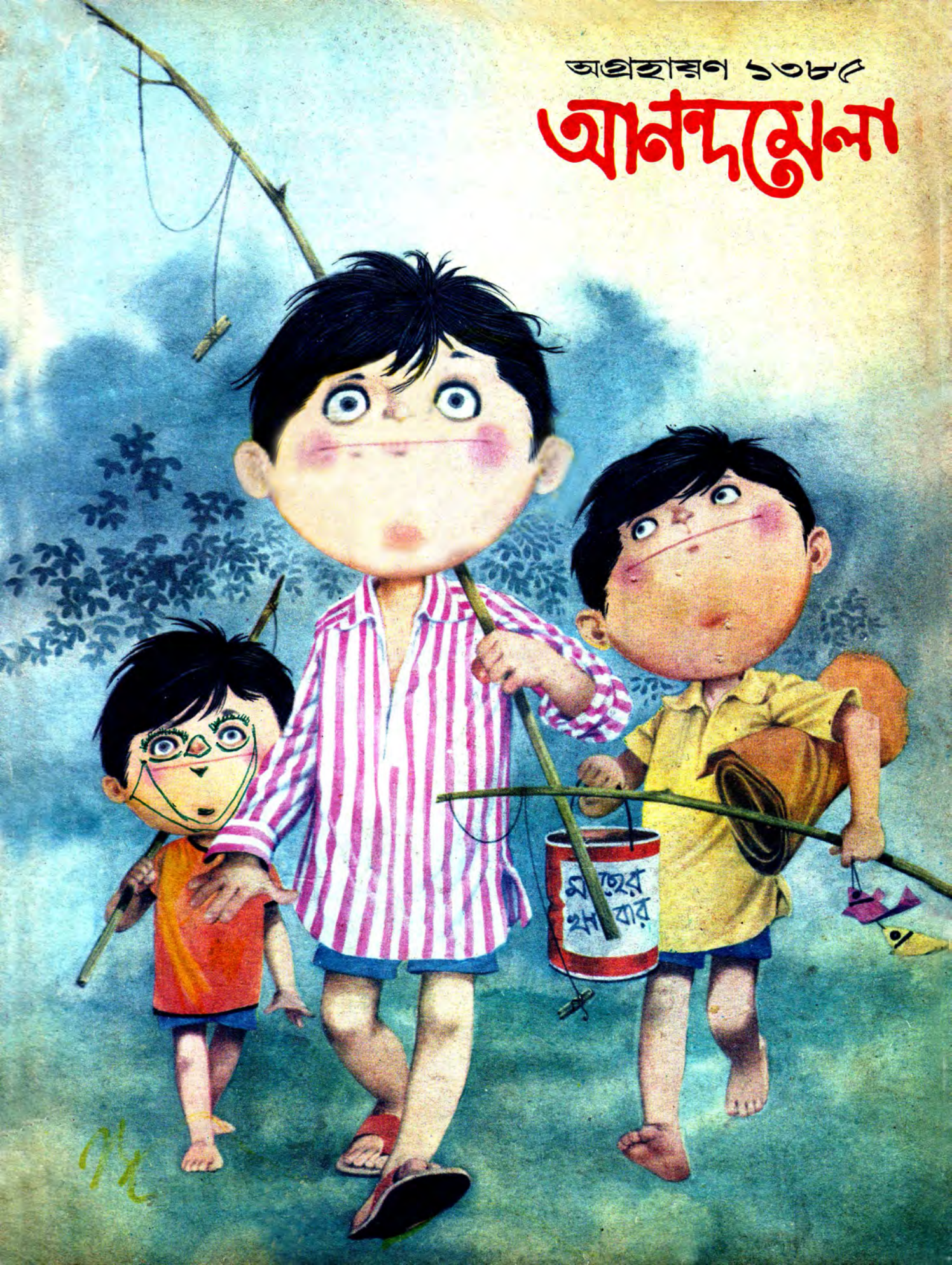

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

কেটে রেখে দিন

বোর্নভিটা আবিষ্কারের আজব কাহিনী-৩

টেপ রেকর্ডারের বিস্ময়কর কথা

আবিষ্কারক : ভ্যাল্ডেমার পৌলসন
১৮৬৯-১৯৪২, ডেনমার্ক

সূত্র : টেপের ওপর চুম্বকধর্ম্মী-কণার আবরণে ধ্বনির দ্বারা উৎপাদিত বৈদ্যুতিক স্পন্দন রেকর্ড করা যায়।

বছর : ১৯০০ (মূল তারের মডেল)

টেপ রেকর্ডার কাজ করে কি ভাবে ?

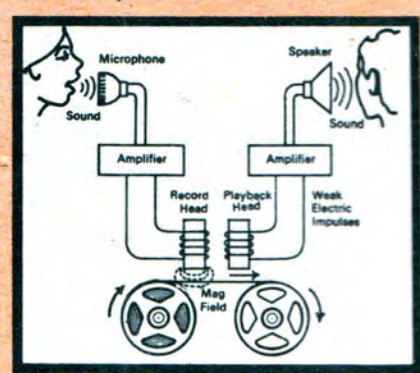

টেপ রেকর্ডার বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা বিশেষ প্লাস্টিক টেপের ওপর ধ্বনি রেকর্ড করে এবং ধ্বনি আবার উৎপন্ন করে। এতে মূলতঃ আছে ২টি স্পুল, একটি রেকর্ডিং-হেড, একটি প্লেব্যাক হেড, একটি মাইক্রোফোন আর একটি স্পীকার।

রেকর্ডিং :

মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ধ্বনি-প্রবাহ নানান-শক্তির বৈদ্যুতিক-স্পন্দনে পরিণত করা হয়। এসব স্পন্দন একটি এমপ্লিফায়ারের দ্বারা আরও বলিষ্ঠ ক'রে রেকর্ডিং-হেডে (এক ইলেকট্রো-ম্যাগনেট) নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এক কম্পমান ম্যাগনেটিক-ক্ষেত্র তৈরী হয়। যখন চুম্বকধর্ম্মী-কণার আবরণ-দেওয়া টেপ এক স্পুল থেকে আরেক স্পুলে রেকর্ডিং হেড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, কণাগুলো তখন ইলেকট্রোম্যাগনেট চৌম্বক-ক্ষেত্র অনুযায়ী ম্যাগনেটাইজ হয়ে যায়। একেই বলে রেকর্ডিং।

প্লেব্যাক :

যে স্পীডে রেকর্ড করা হয়েছিল সেই স্পীডেই টেপটা প্লেব্যাক হেড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাতে বিপরীত-প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক স্পন্দনগুলো স্পীকারের সাহায্যে ধ্বনিতে পরিণত করা হয়। নতুন ক'রে রেকর্ড করার জন্য ধ্বনি টেপ থেকে মুছে ফেলা যায়।

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
তোমাকে দেয় এগিয়ে থাকার বাড়তি শক্তি

OMB-1549-BEN

বিশেষ সুযোগ : ৩

এক বিশিষ্ট পরিবেশকের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে আমরা বৃটেনে মুদ্রিত "The How and Why Wonder Book of Science Experiments" (ইংরেজীতে) ৪০ পাতার রঙীন সচিত্র এবং চিত্তাকর্ষক একটি বই আপনাদের মাত্র ৫ টাঃ ২০ পয়সার সুলভ মূল্যে, (আসল মূল্য ৪০ পেন্স) বিনা ডাক খরচে যোগানোর ব্যবস্থা করেছি। এই বইটি পাওয়ার জন্য আপনি মাণি-অর্ডার দ্বারা ৫ টাঃ ২০ পয়সা আর পৃথক ডাকে বোর্নভিটার যে কোনো প্যাক থেকে একটি ফয়েল বা ওপরের ফ্ল্যাপ পাঠান এই ঠিকানায় : Department : 13B India Book House, 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026. শিগগীর ! বই কিন্তু বেশী নেই।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার
কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

আনন্দমেলা

অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, নভেম্বর ১৯৭৮, চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা
দেড় টাকা

বিশেষ রচনা

সাধারণ কথা । যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৪

গল্প

মোটরবাইক, ষাঁড় ও লাকি । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৫
প্রভাবতীর স্বপ্ন । হেমন্তবালা দেবী ১৭

উপন্যাস

অলৌকিক । বিমল কর ১১
ভুতুড়ে কুকুর । আশাপূর্ণা দেবী ৩৭

ছড়া

লুডো । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৯ ● ডায়মণ্ডহারবার । বাসুদেব দেব ১৯
কেমন বাঘ । দেবাশিস্ বসু ৩৯ ● তোপচাঁচি । শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত ৫২

আত্মকথা

খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ১৪

ভ্রমণ-কাহিনী

ঝরাপাতার উৎসবে । পবিত্র সরকার ২৩

কমিক্স

বিশ্বকাপ-ফুটবল ২১ ● টারজান ২৬ ● টিনটিন ৩০
গোয়েন্দা-বাজ ৩৬ ● নোলেদা ৫৩

লেখাপড়া

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন্-এর ফার্স্ট বয় ৩৩
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৪৩

খেলাধুলো

পরপর চারবার—আবার । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪৪
ক্যাপ্টেন কালীচরণ । পুষ্পেন সরকার ৪৭
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেরা । সুব্রত সরকার ৪৮
ভারত-পাক প্রথম টেস্ট । অশোক দাশগুপ্ত ৫০
মধ্যমগ্রাম স্কুল কি পারবে । বজ্রসেন ৫১

ধাঁধা-মজা-রহস্য

শব্দ-সন্ধান ২৮ ● ধাঁধা ২৮ ● কিসের ফোটো ২৯
উত্তর বটে ২৯ ● মজার খেলা ২৯ ● আটখানা ২৯

অন্যান্য লেখা

তোমাদের পাতা ২২ ● মণিমেলার খবর ৪২ ● দুঃসাহসিক অভিযান ৪৩
আঁকো ৫৪ ● শেখো ৫৪
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের রঙিন ছবি ৫৬

প্রচ্ছদ বিমল দাশ

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি·আই·টি· রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সাধারণ কথা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পিতামাতা গুরুজনে ।
সেবা ক'রো কাজে মনে ॥
ভাই বোন আছে যারা ।
ভালবাসা পাক্ তারা ॥
দাসদাসী যারা ঘরে ।
রেখো সবে সমাদরে ॥
বাড়ীতে অতিথি এলে ।
সেবা ক'রো কাজ ফেলে ॥
ভিখারী ফকির দেখে ।
দয়া ক'রো রেখেটেকে ॥
পাঠশালে গিয়ে যেন ।
গুরুর আদেশ মেনো ॥
ভাল কথা ব'লো সবে ।
তা হ'লে আদর হবে ॥

স্বর্গত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নাম তোমরা সকলেই জানো। এও জানো যে, অগ্রণী এই কবি শুধুই বড়দের জন্য লিখতেন না, ছোটদের জন্যও মুক্তোর মতো নিটোল ও সুন্দর বহু কবিতা তিনি লিখেছিলেন। সে-সব কবিতার অনেকগুলি যে তোমাদের মুখস্থ, তাতেও সন্দেহ নেই। এই নভেম্বরের সাতাশ তারিখে তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হবে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।

কবিকন্যা শ্রীযুক্তা গীতা চৌধুরীর সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় তাঁর পিতৃদেবের একটি খাতা আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে আছে সহজে বর্ণপরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা আশ্চর্য সুন্দর কিছু ছড়া। আমাদের বিশ্বাস, সেগুলি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। খাতার শেষে আছে উপদেশাত্মক একটি কবিতা। সেটি এখানে ছাপা হল। অন্যান্য ছড়া আগামী সংখ্যা থেকে ছাপা হবে।

মোটরবাইক, ষাঁড় ও লাকি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়মামা সকাল থেকেই পেয়ারের কুকুর লাকির ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। পাশের ঘর থেকে শুনছি আমরা, চা-বিস্কুট খেতে খেতে হচ্ছে, "বেরিয়ে যাও ইডিয়েট, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না জানোয়ার, রাসকেল। একটা বিস্কুট আমার দেওয়া ডিউটি, এই নাও। গেট আউট, গেট আউট। না না, ডোণ্ট টাচ্ মাই বডি। উঁহুঁ উঁহুঁ, আদর নয়, আদর নয়। যাও, যাও। মোহন! মোহন! ইডিয়েট মোহন।"

মেজমামা আর আমি এ ঘরে বসে, চা খেতে খেতে গল্প করছিলুম। মেজমামা আমাকে আবিসিনিয়ার কাফ্রীদের গল্প বলছিলেন। এমনভাবে বলছিলেন যেন এইমাত্র ঘুরে এলেন। কথা বলতে বলতে মেজমামার খুব হাত পা নাড়ার অভ্যাস। দুবার কাপ উল্টে যাবার মতো হয়েছিল। গল্পের গভীরে ঢুকে গেলে তখন আর কাপ ডিশের খেয়াল থাকে না। বড়মামা যখন পাশের ঘর থেকে 'মোহন মোহন' করে চিৎকার করছেন, মেজমামা তখন বর্শার ফলায় মানুষের মুণ্ডু গেঁথে নাচাচ্ছেন। বড়মামার চিৎকারে ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। গল্প বলার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বললেন, "বলে এসো তো, মোহন মারা গেছে। আর বলে এসো, ডোণ্ট শাওট।"

মেজমামার হাত থেকে ছাড়া পাবার সব চে বড় সুযোগ। সকালবেলাই সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবেন। মাঝে মাঝে উটকো প্রশ্ন করে আমার জ্ঞান পরীক্ষা করবেন। না পারলেই মিনিটখানেক ছি ছি শব্দ করে বলবেন, যাও, এনসাইক্লোপিডিয়ার ছ ভল্যুমটা নিয়ে এসো, নিয়ে এসো বারো, কি সাত। প্রত্যেকবার টুলে উঠে-উঠে ভারি-ভারি বই পাড়ো, ধুলো ঝাড়ো। আর পাতার পর পাতা রিডিং পড়ো। গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে কি এই জন্যে আসা। এসেছি বাগানের আম, জাম, জামরুল, ফলসা খেতে।

বড়মামার ঘরের দরজার সামনে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখার মতো। দরজার পর্দাটা একপাশে সরানো। জানলার কাছের ছোট টেবিলে, দরজার দিকে পিছন ফিরে বড়মামা বসে আছেন। টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে ধবধবে সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি। পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। পৈতের সঙ্গে বাঁধা চাবি কোমরের কাছে দুলছে। ফর্সা চেহারা। চওড়া পিঠ। নধর মাংসল দুটো হাত।

চেয়ারের হাতলের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে লাকি

লাল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা-ভর্তি সাদা-সাদা বড়-বড় লোম। মুখটা ভারী মিষ্টি। ঝুমকো-ঝুমকো লোমের ভেতর থেকে চকচকে দুটো চোখ উঁকি মারছে। লাকি চেষ্টা করছে বড়-মামার সঙ্গে ভাব করতে। মুখটাকে ছুঁচলো করে ফোঁস ফোঁস করে শুঁকছে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে বড়মামার হাতের ওপর দিকটা চুক চুক করে চেটে দিচ্ছে। লাকি যত কাছাকাছি সরে আসার চেষ্টা করছে, বড়মামা ততই শরীরটাকে ডানদিকে মুচড়ে মুখ ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইছেন, লাকির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আর ডানদিকে ঘোরানো সেই মুখ অনবরত চিৎকার করে চলেছে, 'মোহন, মোহন'।

আমি ঘরে ঢুকতেই লাকি নেমে পড়ল। মুখ নিচু করে আমার কাছে এসে ফোঁস ফোঁস করে বার কতক আমাকে শুঁকে, বুকের ওপর দুটো পা তুলে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করল কিছুক্ষণ। বড়মামা তখনও মুখ ঘুরিয়ে আছেন। কুকুরের মুখ দেখবেন না। বড়মামা ভেবেছেন, মোহন এসেছে। বেশ রেগেই বললেন, "কোথায় থাকিস রাস্কেল! ইডিয়েটটাকে ঘর থেকে বের করে দে। বলে দে, আমার সঙ্গে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো সম্পর্ক নেই!"

"কেন বড়মামা?"

আমার গলা পেয়ে বড়মামা খুব লজ্জা পেয়ে ঘুরে বসলেন। হাসতে গিয়েও হাসলেন না। হাসলেই লাকি দেখে ফেলবে। মুখটাকে বেশ চেষ্টা করে গম্ভীর রেখেই বললেন, "ও, তুমি! আমি ভেবেছিলুম মোহনানন্দ। সকাল থেকে তিনি কোথায় আনন্দ করতে গেলেন?"

লাকিটা এমন করছিল, মাথায় হাত রেখে একটু আদর না করে পারলুম না। বড়মামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "ওর সঙ্গে একদম মিশবে না। একেবারে বখে গেছে। উচ্ছন্নে গেছে!"

"কেন বড়মামা?"

"ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

সে আবার কী! ওকে জিজ্ঞেস করব কী! বড়মামার কুকুর কথা বলে নাকি!

"ও কী করে বলবে বড়মামা! ও কি কথা বলতে পারে!"

"সব পারে, সব পারে, ওর মতো পাকা সব পারে! শুনবে ওর কীর্তি? অকৃতজ্ঞতায় ও মানুষের ওপর যায়, এমন কী, তোমার মেজমামাকেও ছাড়িয়ে যায়!"

আবার মেজমামাকে ধরে টানাটানি কেন! মেজতে বড়তে ভাবও যেমন, ঝগড়াও তেমন। গতকাল রাতে খেতে বসে আম নিয়ে ঝগড়ার জের চলেছে বুঝলাম। বড়মামা কবে নাকি গোলাপখাস বলে নার্সারি থেকে একটা আমগাছ খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাগানে বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার বাগানেই খালি এই আম হত, এইবার হবে সুধাংশু মুকুজ্যের বাগানে। সেই গাছে এবছর প্রথম আম ধরেছে। আর সেই আম খাওয়া হচ্ছিল কাল রাতে। মেজমামা ঘন দুধে আম চটকে এক চুমুক খেয়েই, ব্যালাব্যাম বলে মুখের একটা শব্দ করে বাটিটা নামিয়ে রেখেই বললেন, "বড়দা, এই তোমার গোলাপখাস, এর নাম তেঁতুলখাস। দুধটাই নষ্ট হয়ে গেল। কী ক্ষতিই যে হল! দুধ না খেলে আমার আবার সকালে ভীষণ অসুবিধে হয়।"

বড়মামা ততক্ষণে আমটা চেখেছেন। বড়মামার মুখের চেহারাও ভীষণ করুণ। কিন্তু মেজর কাছে হেরে গেলে চলবে না। বললেন, "জীবনে রিয়েল গোলাপখাস তো খাসনি। সে খেয়েছি আমরা। গোলাপখাস একটু টকমিষ্টিই হয়! তবেই না তার টেস্ট! তোর মতো নাবালকের বোম্বাই-টোম্বাই খাওয়া উচিত।"

আপনার সোনামণির জন্য বাদশাহী পুডিং-রেক্স জেলী

OBM-7796 RBN

আপনার সোনামণি রেক্স জেলী একবার খেলে আর ভুলতেই পারবেনা। ওকে আদর করে এই মজাদার পুডিং খেতে দিন···দেখুন কেমন স্ফূর্তিতে নেচে ওঠে ওর মন!

তৈরী করা কত সহজ!

এক কাপ ফুটন্ত জলে রেক্স জেলীর এক প্যাকেট গুলে নিন।

ততটা ঠাণ্ডা জল মেশান যাতে মিশ্রণটি ২ কাপ আন্দাজমত হয়।

এবার এই মিশ্রণটি একটি ছাঁচে ঢালুন এবং ফ্রিজের ওপর কিংবা রেফ্রিজারেটরে জমে যেতে দিন।

বাস, এবার পুডিং তৈরী... মজাদার ৪টি সুস্বাদ থেকে বেছে নিন।

ফল দেওয়া জেলি

প্যাকেটের ওপরে দেওয়া নির্দেশানুসারে
১ প্যাকেট রেক্স জেলি গুলে নিন।
২. বরফে বা ফ্রিজে রেখে জমান।
৩. জেলি যখন ঘন আর থরথরে হয়েছে কিন্তু জমেনি তখন তাজা আনারস ছাড়া আর যেকোন ফল ২½ কাপ মতো ঢেলে দিয়ে মেশান।
৪. সঙ্গে সঙ্গে জমিয়ে নিন।

কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ.

রাত এগারোটা পর্যন্ত এঁটো হাতে দু ভাইয়ে আম নিয়ে খুব দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। শেষে সিদ্ধান্ত হল, বড়মামার গাছ বড়মামারই থাক। মেজমামা ল্যাংড়াই খাবেন। গোলাপ ফুল ভদ্রলোকে হয়তো সহ্য করতে পারে, তবে গোলাপখাস ভদ্রলোকের আম নয়। শিশুরা খেতে পারে, কারণ শিশু আর ছাগল একই জাতের জিনিস।

বড়মামা লাকির অকৃতজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মেজমামার সঙ্গে তুলনা করলেন। করে বললেন, "কুকুর কখনও মানুষ হয় না, বুঝেছ? মানুষ কিন্তু কুকুর হতে পারে।"

কথাটা শুনে কিনা জানি না, লাকি বারকতক ভেউ ভেউ করে উঠল। বড়মামা বললেন, "ওকে চুপ করতে বলো। এখানে কাজের কথা হচ্ছে।"

আমাকে বলতে হল না। বুদ্ধিমান কুকুর নিজেই বুঝতে পেরেছে। সামনের থাবায় মুখ রেখে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড়মামা আড়চোখে একবার দেখে আবার শুরু করলেন, "মাসে কুড়ি টাকার বিস্কুট। সত্তর টাকার মাংস। পঞ্চাশ টাকার দুধ। তিন কৌটো পাউডার। পঁচিশ টাকার ওষুধ। পনের টাকার সাবান। সব, সব ভস্মে ঘি ঢালা। সেই অকৃতজ্ঞ কুকুর আজ আমাকে অপমান করেছে। নিজের ভাই অপমান করলে সহ্য হয়, প্রতিবেশী লাথি মারলেও হজম করে নিতে হয়। নিজের কুকুর অপমান করলে সহ্য হয় না। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।"

বড়মামা লাকির দিকে সামান্য ঝুঁকে বেশ জোরে জোরে বলে উঠলেন, "বুঝেছিস? আত্মহত্যা, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। না, নো, নো, ন্যাজ নাড়লে আমি আর ভুলছি না। তোমার ন্যাজের খেলা আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। নো সম্পর্ক।"

লাকি সামনের থাবায় সেই ভাবে মুখ রেখে, চোখ বুঁজিয়ে বুঁজিয়ে, পটাক পটাক করে ন্যাজ নাড়ছে।

এতক্ষণ অনেক কথা হল, বড়মামার রাগের কারণটা কিন্তু বোঝা গেল না। কাল রাতে শুতে যাবার আগে, আম নিয়ে মেজমামার সঙ্গে রাগারাগি হয়ে যাবার পর খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে, কুকুরকে পেটের ওপর ফেলে বড়মামা যেসব কথা বলছিলেন তার কিছু কিছু তো এখনও মনে আছে। বুরুশ বোলানো হচ্ছে কুকুরের লোমে, আর কথা হচ্ছে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি, তুই এবার একদিন মানুষের মতো কথা বলবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানুষের চে তুই ফার, ফার, ফার, ফার বেটার। অ্যাই কী হচ্ছে কী, নাল লেগে যাচ্ছে না মুখে! উঁহু, উঁহু, আর না, আর না। দেখি পেটের দিকটা, চিত হও, চিত হও। কী হল, কাতুকুতু লাগছে?"

সেই কুকুর কী এমন করল। এই সাতসকালে ঘন্টাখানেকের মধ্যে মেজমামা ওদিকে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন। "কী হল হে তোমার! এখানে জ্ঞানের কথা হচ্ছে, ভাল লাগবে কেন! গিয়ে পড়লে কুকুরের খপ্পরে।"

বড়মামার কপালটা একটু কুঁচকে গেল। আমাকে বললেন, "জিজ্ঞেস করো তো কুকুর কি জ্ঞানের জগতের বাইরে। দর্শনশাস্ত্রটাই জ্ঞান, প্রাণী-তত্ত্বটা জ্ঞান নয়, ফেলনা জিনিস? জিজ্ঞেস করো তো পৃথিবীতে কত রকমের কুকুর আছে জানে কিনা! ওর জ্ঞানের দৌড় জানা আছে। পৃথিবীটাই জানা হল না, উনি ঈশ্বর ভগবান এই সব নিয়ে ভেবে ভেবে মরে গেলেন।"

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললুম, "এখুনি আসছি মেজমামা।"

"ধ্যাত! তোর আঠার মাসে বছর। আসতে আসতেই আমার কলেজ যাবার সময় হয়ে যাবে। ভেবেছিলুম, পৃথিবীর একটা পার্ট শেষ করে যাব।"

কথা শেষ করেই মেজমামা, 'মোহন, মোহন' করে চেঁচাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড়মামারও মনে পড়ল মোহনের কথা। দুজনেই তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'মোহন, মোহন!'

লাকিটা বকুনি-টকুনি খেয়ে বেশ ঘুমিয়েই পড়েছিল। চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে পড়ে, ছোট্ট একটা ডন মেরেই বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বার কতক ভেউ ভেউ করে, রাস্তার দিকের জানলায় পা দুটো তুলে দাঁড়াল।

আমি এক কদম এগিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিলুম। কেন কুকুরটা ওরকম করছে! সামনের বাড়ির বারান্দায় ঠিক লাকির মতো আর একটা কুকুর এ জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পুটুক পুটুক ন্যাজ নাড়ছে। ও কুকুরটা কিন্তু এটার মতো কেঁউ কেঁউ করছে না বা পাগলের মতো দৌড়োদৌড়ি করছে না। দেখলেই মনে হয় কুকুরটা একটু দুষ্টু ধরনের। আমার বন্ধু অরুণের মতো। পড়ার ঘরে বেশ মন দিয়ে হয়ত পড়তে বসেছি, বাইরের জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে একটুও কথা নেই। মুচকি মুচকি হাসি, স্থির দৃষ্টি। চোখের পাতা নাচিয়ে যা বলার বলে গেল—বইপত্তর মুড়ে উঠে আয়, পড়ার সময় অনেক পাবি, এমন সকাল পাবি কোথায়! অমনি, এই লাকির মতোই মনটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল। বাইরের চুপচাপ লাকি ভেতরের বন্দী লাকিকে ডাকছে।

"আজ সকাল থেকে তুমি এই করছ।" বড়মামার তর্জন-গর্জন থামেই না দেখি। সকালেই আমি তোমাকে ভাল কথায় বুঝিয়েছি, বাইরে যাওয়া চলবে না, বাইরের কুকুরের সঙ্গে মেশা চলবে না। বাগান আছে, তুমি বাগানে ঘোরো, ছাদ আছে, ছাদে কাঠের বল নিয়ে খেল। আমি যতক্ষণ আছি আমার সঙ্গে ঘোরো, খেলা করো। কিন্তু মিত্তিরদের বাড়ির ওই নোংরা কুকুর দেখে তোমার মাথা খারাপ করা চলবে না। ওরা আমাদের তিনপুরুষের শত্রু।

"এই যে মোহন," বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন। ফিরে দেখলুম মোহন মেজমামার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। "ফার্স্ট আমি ডেকেছি, তুই আগে আমার কাছে আসবি!"

মেজমামা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন. "ফার্স্ট সেকেণ্ডের কী আছে রে। তুই আগে আমার ওষুধ তৈরি করে দিয়ে তারপর যেখানে যেতে হয় যাবি।"

বড়মামা বললেন, "বা হে বাঃ; খলে ঘষে ঘষে তোমার কবিরাজী ওষুধ তৈরি করে ও সকালটা কাটিয়ে দিক, এদিকে আমি বসে থাকি হাঁ করে। কুকুরের জন্য কিমা না আনলে ও দুপুরে খাবে কী, উপোস করে থাকবে!"

"কিমা! কুকুরের কিমা!" মেজমামা এমন ভাবে হাসলেন যেন বড়মামা অদ্ভুত উদ্ভট কোনো কথা বলেছেন। তারপর বড়মামার চোখের সামনে আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, "জানো না রাস্তায় সব গাড়ির আগে যায় অ্যামবুলেনস আর ফায়ার ব্রিগেড। এমার্জেন্সি, বুঝেছ, এমার্জেন্সি। যা মোহন, প্রথমে ঘষবি দারু হরিদ্রা, তাতে দিবি গোলপ্তর জল, বড়িটাকে ১৫ মিনিট খলে ঘষবি মধু দিয়ে, তারপর সব এনে হাজির করবি আমার টেবিলে। চলো ভাগনে!"

আমি কিছু প্রতিবাদ করার আগে মেজমামা আমাকে প্রায় হাতে হাতকড়া লাগাবার মতো করে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন, "মূর্খ হয়ে থাকতে চাস। জানিস, পৃথিবীতে কত কী শেখার আছে! এক জীবনে মানুষ সব পারে না।" আমি বললুম, "তাই তো হাঁসের মতো দুধ আর জল থেকে শুধু জলটা তুলে নিতে চাই।"

"উল্টে গেল হে, উল্টে গেল", কথা বলতে-বলতে মেজমামা আলমারি খুলে একটা বুলওয়ার্কার বের করলেন. "বুঝেছ, যারা মাথার কাজ করে তাদের একটু করে ব্যায়াম করা উচিত।" মেজমামা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বুলওয়ার্কার টানতে

লাগলেন। যতটা না টানছেন তার চে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

একটা মোটর সাইকেল সশব্দে বাড়ির সীমানা থেকে উল্কার মতো বেরিয়ে গেল। বড়মামা এমনিই খুব জোরে চালান, আজ আবার রেগে আছেন। নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন দেড় মাইল দূরের বাজার থেকে কিমা কেনার জন্যে। জাফরের দোকান ছাড়া মাংস কেনা চলবে না। তা না হলে কাছাকাছি আরও একটা দোকান ছিল।

দু মামা আর এক মাসির কাণ্ডকারখানা চলেছে এ-বাড়িতে। বড়মামা ডাক্তার। মেজমামা প্রফেসর। মাসি সকালের স্কুলের টীচার। বাড়িতে গরু আছে, পাখি আছে, কুকুর আছে, বাগান আছে, একগাদা কাজের লোক আছে। মাঝেমাঝেই বড়মামা মেজমামার লড়াই আছে, গলায় গলায় ভাব আছে। নেই কেবল মামিমা। বুড়ি দিদিমা ছেলেদের ওপর রাগ করে কাশীবাসী।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বড়মামা ফিরছেন না। স্নানের পর গায়ে পাউডার মাখতে মাখতে মেজমামা বললেন, "বাবা! বড়বাবু কি ব্যারাকপুর থেকে খিদিরপুর গেলেন কুকুরের কিমা কিনতে। কুকুর কুকুর করেই ডাক্তারবাবু কাবু হয়ে গেলেন। তুমিই বলো, ওষুধ আগে না কুকুর আগে।"

কী আর বলব, চুপ করে শুনছি। ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, মাসি এসে গেলে তবু আর একদফা মুখরোচক খাবার-দাবার জুটত।

মেজমামার জামাকাপড় পরা হয়ে গেল। জানলা দিয়ে উত্তর-দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভাবালে দেখছি। উঁহু ভাল ঠেকছে না হে। এতক্ষণ দেরি হবার তো কথা নয়। বাবু রেগেমেগে যেভাবে বেরিয়ে গেলেন। এসব রাস্তায় অত জোরে গাড়ি চালানো কি ঠিক! না ফিরলে বেরোতেও পারছি না। এদিকে প্রথম ক্লাসের সময় হয়ে এল। লণ্ডে করে গঙ্গা পেরোতেই তো আধঘন্টা লেগে যাবে।

হঠাৎ দূরে মোটর বাইকের শব্দ হল। ভীষণ বেগে আসছে। আমরা জানলার কাছে সরে এলুম। মেজমামা বললেন, "মনে হচ্ছে বড়বাবু!" হ্যাঁ বড়মামাই। লাল ঝকঝকে মোটর সাইকেল। পরনে লাল লুঙ্গি। গায়ে গোলগলা গেরুয়া গেঞ্জি। উল্কার বেগে বড়মামা বাড়ির সামনে দিয়ে পশ্চিমে বেরিয়ে গেলেন। মাথার ঝাকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে নটরাজের জটার মতো। বড়মামার দশহাত পেছনে বারাকপুরের বিখ্যাত ভোলা। সেও খ্যাড়াখ্যাট খ্যাড়াখ্যাট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ভোলা হল ইয়া তাগড়া এক ষাঁড়। বাজার অঞ্চলে, ভক্ত ভোলার সংখ্যা, কম নয়।

মেজমামা বললেন, "সেরেছে! বড়বাবুকে দেখছি গঙ্গার জলে না ফেলে দেয়। একে ভোলা, তায় লাল মোটর বাইক, তার ওপর লাল লুঙ্গি, তার ওপর ওই পিলে-ফাটানো শব্দ। কে বাঁচাবে বড়বাবুকে!"

মেজমামা চিন্তিত মুখে, ঘর থেকে রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমি পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। বলতে কী, দারুণ মজাই লাগছিল। রেসটা বেশ জমেছে! বড়মামা হারেন, কি ভোলা হারে! রাস্তাটা সামনে গিয়ে গোল একটা প্যাঁচ মেরে আবার ফিরে এসেছে। বেশ জটিল ট্র্যাক। বড়মামা ঘুরে আসছেন, এবার বেগ আরও বেশি। ভোলার স্পীডও যেন বেড়ে গেছে। ভোলা ভীষণ রেগে গেছে, বড়মামাকে হারাতে পারছে না কিছুতেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বড়মামা চিৎকার করে বললেন, "শান্তি, ষাঁড়টাকে কোনরকমে গ্যারেজ করে দে।"

মেজমামা চিন্তিত মুখে বললেন, "কী করে ষাঁড় গ্যারেজ করি বলো তো। ষাঁড় তো আর গাড়ি নয়!" দুজনে নেমে রাস্তার পাশে এলুম। কাজের লোকজন কাজ ফেলে এসেছে। মোহনের নানা প্ল্যান। সে একটা লাঠি এনেছে। ষাঁড়কে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেবে। অতই সহজ। নিজেই ছিটকে পড়বে নর্দমায়! মজা দেখার জন্যে আশেপাশের বাড়ির জানলা দরজায় বড় ছোট মুখ। মিত্তির-দের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি কিশোর হুইসিল বাজাচ্ছে।

বড়মামা ওদিককার গোল রাস্তা দিয়ে আবার এদিকে তীর-বেগে আসছেন। পেছনে ল্যাজ তুলে ভোলা। এদিকে প্রথম রাস্তায় যাবার সময় বড়মামা বললেন, "একটা কিছু কর, তেল ফুরিয়ে আসছে। আর পারছি না।" বড়মামা আসতেই মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটা ফুরর ফুরর করে বাঁশি বাজাল। সমস্ত জমায়েত পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে উঠল।

পশ্চিমের দিক থেকে বড়মামা আবার আসছেন। বড়মামা বেশ ক্লান্ত, বিব্রত। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের পাশ দিয়ে তীরবেগে সাদা মতো কী একটা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল—বড়মামার কুকুর লাকি। ভয়ে আমরা চোখ বুজে ফেলেছি। দু গজ দূরে বিশাল ভোলা লাফাতে লাফাতে আসছে। লাকি একলাফে ভোলার মুখের ওপর লাফিয়ে উঠল। ভোলার চোখ চাপা পড়ে গেছে, লাকি নাক কামড়ে ধরেছে। ভোলা এক ঝটকা মেরে লাকিকে ফেলতে ফেলতেই বড়মামা ঘুরে এসেছেন, মোহন লাঠি বাগিয়ে তেড়ে গেছে। এইবার উল্টো রেস—ভোলা ছুটছে আগে, বড়মামা তাড়া করে পেছনে।

আমরা দৌড়ে গেলুম লাকির কাছে। একটা বাড়ির রকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যে মেজমামা কুকুর দেখলে দশ হাত দূরে পালান, সেই মেজমামা কলেজে যাবার ধবধবে পোশাকে লাকিকে কোলে তুলে নিয়েছেন। চোখ দুটো ছলছলে। ভোলাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, বড়মামা ফিরে এসে বাইকটাকে কোন রকমে ফেলে রেখে, ধরা গলায় লাকি লাকি করছেন। মাসিও এসে গেছেন।

দেখতে দেখতে বাড়ি হাসপাতাল। বড়মামার বন্ধু পশু-চিকিৎসক ডাক্তার বরাট এসে গেছেন। দুই মামারই বারেবারে এক প্রশ্ন, "বাঁচবে তো, বাঁচবে তো!" বরাট বলছেন, "বেশ একটু শক লেগেছে। সারতে সময় লাগবে কয়েক দিন। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলুম।"

সন্ধেবেলা লাকি বড়মামার নরম বিছানায় পাখার তলায় ঘুমোচ্ছে। মাসি চিঁড়ে ভাজছেন। মেজমামা ইজিচেয়ারে বসে বিশাল মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। মুখটা খুব বিষন্ন। মাঝে-মাঝে পিট পিট করে লাকির দিকে তাকাচ্ছেন। বড়মামা দুপুর থেকে লাকির পাশে সিস্টারের মতো বসে আছেন।

হঠাৎ বড়মামা বললেন, "বুঝলি শান্তি! রাগ চণ্ডাল।"

মেজমামা বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ। আমরা দুজনেই ভীষণ রাগী।"

বড়মামা বললেন, "বাবা ভীষণ রাগী ছিলেন।"

মেজমামা বললেন, "মা-ও তা-ই। বরং বেশিই ছিল।"

বড়মামা বললেন, "আসছে বার কুকুর হয়ে জন্মাব।"

মেজমামা বললেন, "আমিও। লাকিকে দেখে আজ আমার জ্ঞান হল।"

বড়মামা মেজমামার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "হাত মেলা।" দু মামার করমর্দন, আর ঠিক সেই সময়ে সারা-দিন পরে লাকি প্রথম দুবার শব্দ করল—ভুক, ভুক। সঙ্গে সঙ্গে দু মামার উল্লাসের চিৎকার, "লাকি, লাকি।" লাকি বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে ডাক ছাড়ল, "ভৌ, ঔ।"

ছবি বিমল দাশ

লুডো

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

একটা দিয়ে একটা মারব
জোড়া দিয়ে জোড়া,
এই ছুটিয়ে দিলুম আমার
সবুজ ঘুঁটির ঘোড়া।
যা রে সবুজ, যা,
দুই ছক্কা চার দিয়ে তুই
হলুদে ঘুঁটি খা।

বলিস কী রে, বড্ড দেখি
বেড়েছে তোর বাড়।
একটু দাঁড়া, মট্‌কে দেব
এক্ষুনি তোর ঘাড়।
যা রে হলুদ, যা,
পাঞ্জা ফেলে সাব্‌ড়ে দে ওই
সবুজে ঘুঁটির ছা!

হাঃ হাঃ হাঃ, পাঞ্জা কোথায়,
পড়ল দেখি এক!
এইবারে কী লণ্ডভণ্ড
কাণ্ড করি দ্যাখ্!
যা রে সবুজ, যা,
হলুদে ঘুঁটি সব কটাকেই
কচকচিয়ে খা!

আরে আরে, খাবি তো খা
লুডো খেলার ঘুঁটি,
তার বদলে হঠাৎ কেন
ধরলি আমার ঝুঁটি?
মারলি কেন ঠেলা?
দুষ্টু পাজি বদমেজাজি
এটা কেমন খেলা?

ছবি বিমল দাশ

সুরেশ জোরে কদমে চলছে

সুরেশ রোজ নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে। নিউট্রামূল হ'ল আমূলের তৈরী সুস্বাদু শক্তিবর্ধক পানীয়। আমূল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামূলে আছে—আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।

আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্বেও নিউট্রামূলের দাম কম। নিউট্রামূলের ৫০০ গ্রাম টিন মাত্র ১২ টাকা ২১ পয়সা, স্থানীয় কর, সেণ্ট্রাল সেল্স ট্যাক্স ও মাশুল আলাদা।

সুরেশ আর এখন জগ্গুও সারাদেশের হাজার হাজার লোকের মতনই রোজ নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে।

আমূল-এর
নিউট্রামূল

daCunha/N/3 Ben

উপন্যাস

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা একটা ভূতুড়ে ছবি দেখতে সিনেমায় গিয়েছিল। ছবি দেখতে গিয়ে অদ্ভুত ধরনের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর। ওঁর কাজ হল মানুষ নিয়ে গবেষণা। সাধারণ মানুষ নয়, এমন সব মানুষ, যাদের মধ্যে অস্বাভাবিক অলৌকিক কোনো গুণ রয়েছে। দুমকার কাছে সেই গবেষণা-কেন্দ্র।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে নিয়ে এলেন দুমকার সেই রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে মহাদেব বলে একটা লোক জুটেছিল, যার সঙ্গে বরদার চেহারায় খুব মিল। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে বিশ্বাস করতেন না। মহাদেবকে তিনি শয়তান বলে মনে করতেন। মহাদেবের উদ্দেশ্য এই রিসার্চ সেন্টার থেকে দু-চার জনকে বাইরে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকাপয়সা কামানো, মানুষকে ঠকানো। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে জব্দ করতে চাইছিলেন। কিন্তু বরদাকে আনার পর নিজেই জব্দ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রায় চোখের সামনেই এক টাঙাওয়ালা খুন হয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর সন্দেহ করলেন, সুজন বলে একটা লোক, যার গায়ে অসুরের মতন ক্ষমতা, সে মহাদেবের প্ররোচনায় খুন করেছে টাঙাওয়ালাকে। সন্দেহ করলেন বটে, কিন্তু সুজন কোথায়?

সুজনের খোঁজ চলতে লাগল। কিন্তু এরই মধ্যে মহাদেব এসে বরদাকে শাসিয়ে গেল। বলে গেল, দিন তিনেকের মধ্যে বরদা যদি কলকাতায় ফিরে না যায়, তবে তার অবস্থাও টাঙাঅলার মতন হতে পারে।

ইতিমধ্যে আবার বরদার ঘরে ঢুকে কেউ তার সুটকেস খুলেছিল। খুলে জামাকাপড় কিছু নেয়নি অবশ্য, কিন্তু অদ্ভুত এক কাজ করেছে। সুটকেস থেকে বরদার নতুন মোজা বার করে তার জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। আর পুরনো মোজাজোড়া জুতো থেকে বার করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। সিদ্ধেশ্বর বললেন, এটা সুজনের জন্যেই করা হয়েছে। মহাদেবই করেছে। সুজন জামা-কাপড়ের গন্ধ শুঁকে তার মালিককে আক্রমণ করতে পারে। বরদা বড় ভয় পেয়ে গেল। সে আর থাকতে চাইল না। জেদ ধরল, তাকে কলকাতায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলকাতা ফেরার ব্যবস্থা করে দিলেন সিদ্ধেশ্বর বরদার। সতীশ ডাক্তারের মোটরবাইকের পেছনে চড়ে সন্ধেবেলায় তাকে রামপুরহাট স্টেশনে আসতে হবে। বরদা সেইভাবেই আসছিল। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি গেল খারাপ হয়ে। আর আশপাশ থেকে কে যেন এসে হাজির হল। এল মহাদেব। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় আসেনি। সিদ্ধেশ্বর তাকে নিয়ে এসেছেন বরদার প্যান্ট-শার্ট পরিয়ে বেহুঁশ অবস্থায়। সিদ্ধেশ্বর জানেন, সুজন এখানেই আসবে। আসবে বরদাকে খুন করতে মহাদেবের নির্দেশ-মতো। কিন্তু সুজনের মুখের সামনে তিনি এই মহাদেবকেই ফেলে রাখবেন। যাতে সুজন ভুল করে, তাই মহাদেবকে বরদার মতন করে সাজিয়ে এনেছেন। সুজনও সামান্য পরে এল। তারপর—

১৬

সুজন এগিয়ে আসছিল। ধীরে-ধীরে। দাঁড়াল একবার। তাকাল যেন এদিক-ওদিক, তারপর পা-পা করে এগিয়ে আসতে লাগল।

বরদার মনে হল, সুজন চোখে এ-সময় ভাল দেখতে না-পেলেও কানে তো শুনতে পায়, সতীশের গলা সে শুনেছে, শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একবার দেখে নিল। হয়ত সাবধান হল।

মহাদেবের এতটা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিল না বরদার। ভয় করছিল। হাত-পা কাঁপছিল। চাপা গলায় বলল, "চলুন, আমরা সরে যাই।"

সিদ্ধেশ্বর বরদার হাত ধরে টানলেন, "হ্যাঁ, এখানে আর নয়।"

বরদা কয়েক পা পিছু হটল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে প্রায় দৌড় দেবার মতন করে অনেকটা পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কাছাকাছি একটা ঝোপের সামনে।

সিদ্ধেশ্বর হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন বরদার। তিনিও পিছিয়ে এলেন খানিকটা—তবে বরদার মতন দৌড়লেন না।

বড়দা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

জ্যোৎস্নার হালকা ভাবটা কেটে গেছে অনেকক্ষণ; সামান্য গাঢ় দেখাচ্ছিল চাঁদের আলো। ঝিঁঝির ডাকের মতন একটা শব্দ চারদিকে, বাতাসে শীতের কনকনে ভাব। বরদা ভয়ে যতটা কাঁপছিল, শীতে ততটা নয়।

সতীশ তার মোটর-বাইকের এঞ্জিন বন্ধ করে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বরদা দূর থেকে সুজনকে দেখছিল। সবই অস্পষ্ট; তবু মনে হল, চেহারাটা সাধারণ নয়। দৈত্যের মতনই দেখাচ্ছিল তাকে। বেশ লম্বা, এক মাথা চুল, বাবরি ধরনের। বোধহয় গায়ের রঙও কালো। মহাদেবের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছিল সুজন।

সিদ্ধেশ্বর খানিকটা পিছিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বরদা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে—অত পেছনে নয়, তার থেকে সামান্য এগিয়ে।

মহাদেবের জন্যে দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। শয়তানটা তাকে মারতে চেয়েছিল। টাঙাঅলাকে মেরেছে। তবু এখন অসহায় মহাদেবের জন্যে কেমন যেন দুঃখই হল বরদার। হিংস্র বুনো বাঘের মুখের সামনে দড়ি-বাঁধা ছাগলকে রেখে দিলে যেমন অবস্থা হয় তার, মহাদেবেরও সেই অবস্থা। কিছু করার নেই মহাদেবের।

সুজন মহাদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মহাদেব তার পায়ের কাছে।

বরদার বুক ধকধক করছিল। চোখের সামনে একজন অন্য আরেক জনের ঘাড় মটকাবে—এই দৃশ্য সে দেখতে পারবে না। তার অত সাহস নেই। কলকাতার রাস্তায় কোথাও কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শুনলে তার ধারেকাছে সে এগোয় না।

চোখ বন্ধ করল না বরদা, কিন্তু সতর্ক থাকল; তেমন কিছু দেখলেই সে চোখের পাতা বুজে ফেলবে।

সুজন মহাদেবকে তুলে ধরেছে। উঠতে পারছে না মহাদেব। টলে পড়ছে। সুজন মহাদেবকে কোনো রকমে দাঁড় করিয়ে যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল জামার। ঝাঁকি দিল। মুঠো করে চুল ধরল; ঝাঁকুনি দিল বার কয়েক। তারপর অদ্ভুত এক শব্দ করল, পশুর মতন।

মহাদেব তার হাত দুটো মাথার ওপর তুলল। তারপর কী যে হল, বরদা বুঝল না—, সুজন মহাদেবের গোটা শরীরটা মাথার ওপর তুলে নিল। দু হাতে মহাদেবকে মাথার ওপর তুলে আচমকা ছুঁড়ে দিল। আর্তনাদ করে উঠল মহাদেব। এই নিস্তব্ধ জঙ্গলে মহাদেবের সেই করুণ আর্তনাদ বীভৎস শোনাল। হাত-পা অসাড় হয়ে এল বরদার।

সুজন দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে। হাত কয়েক দূরে মহাদেব পড়ে আছে। তার আর্তনাদ থামছে না। যন্ত্রণার, কান্নার অদ্ভুত এক শব্দ ভেসে আসছিল।

সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বরদাকে ডাকলেন, "টর্চটা আপনার কাছে?"

বরদার গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনো রকমে সাড়া দিল।

"আমায় দিন।"

ঝোপ ছেড়ে এগুবার সাহস হল না বরদার।

সিদ্ধেশ্বর নিজেই সামান্য পিছিয়ে এলেন। "দিন।"

বরদা টর্চটা দিল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না। দৌড়বেন না।"

"আপনি?"

"আমি সুজনের কাছে যাচ্ছি।"

"সুজনের কাছে?" বরদা চমকে উঠল।

"মহাদেব এখনও মরেনি। মরবে। সুজন আবার তাকে ধরবে। ওই দেখুন—।"

সুজন আবার মহাদেবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ধরবে আবার। এবার হয়ত পুরো ঘাড়টাই ভেঙে দেবে। হাত দুটো সাঁড়াশির মতন সামনের দিকে বাড়ানো।

সিদ্ধেশ্বর কিন্তু দাঁড়ালেন না। এগিয়ে চললেন।

বরদা দেখল, সিদ্ধেশ্বরের এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে তাঁর সেই সরু ছোরা। ছোরাটা যে তাঁর সঙ্গে ছিল, বরদা জানত না।

সিদ্ধেশ্বর যে কেন যাচ্ছেন, কী তাঁর মতলব—বরদা বুঝতে পারছিল না। মহাদেব মরছে মরুক, সিদ্ধেশ্বর কেন যাচ্ছেন ওই দৈত্যটার কাছে!

এগিয়ে যেতে-যেতে সিদ্ধেশ্বর চিৎকার করে বললেন, "সুজন—সুজন ; আমি এখানে।"

সুজন মহাদেবের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, ঝুঁকে পড়ে তাকে তুলে নিয়েছিল মাটি থেকে। হঠাৎ ডাক শুনে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে মহাদেবের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

যদিও জ্যোৎস্না তবু সুজন যেন সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছিল না। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না বলেই শুধু নয়, সিদ্ধেশ্বরের গায়ে কালো পোশাক। তাঁকে ছায়ার মতন মনে হচ্ছিল। তিনি রাস্তার ধার ঘেঁষে এগুচ্ছিলেন, গাছের ছায়ায় গা ঢেকে যেন। কিন্তু জায়গাটা মাঠের মতন, গাছ তেমন একটা নেই।

সুজন চারদিক তাকাচ্ছিল। শব্দ অনুমান করেই। সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছিল না।

এগিয়ে গেলেন সিদ্ধেশ্বর। অনেকটা কাছাকাছি। তারপর টর্চ জ্বাললেন।

সুজন ঘুরে দাঁড়াল।

আলোটা আবার নিবিয়ে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। দিয়ে এক ছুটে রাস্তার অন্য পাশে চলে গেলেন। "সুজন, আমি এখানে।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল সুজন।

সিদ্ধেশ্বর যেন সুজনের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। একবার কাছে যান, আবার দু-চার পা পিছিয়ে আসেন ; কখনো রাস্তার ডান পাশে, কখনও বাঁ পাশে। আবার কখনো মাঝ-মধ্যিখানে। ঝপ করে টর্চটা জ্বালান, নিবিয়ে দেন। মাঝে-মাঝে মুখে আলো ফেলেন সুজনের। আলো চোখে পড়তেই সুজন দু হাতে চোখ আড়াল করে নেয়। চিৎকার করে জন্তুর মতন।

বরদা কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিন্তু খেলাটা দেখছিল। অপলকে। সিদ্ধেশ্বর সুজনকে যেন ডাকছেন কাছে আসার জন্যে, তাঁকে ধরার জন্যে।

সুজন যেন কানামাছির খেলায় চোখ-বাঁধা চোরের মতন একবার এদিকে এগোচ্ছিল, আর-একবার অন্য দিকে। সিদ্ধেশ্বরকে সে আন্দাজ করতে পারছিল না। ক্রমশই খেপে

যাচ্ছিল। দু হাত বাড়িয়ে এদিক-ওদিক এগোচ্ছিল, চেঁচাচ্ছিল—যেন একবার সিদ্ধেশ্বরকে ধরতে পারলেই সে এই খেলার পরিণামটা বুঝিয়ে দেবে সিদ্ধেশ্বরকে।

সিদ্ধেশ্বরও সুজনকে ক্রমশ নিজের পছন্দ মতন জায়গায় টেনে নিচ্ছিলেন, ধোঁকা দিয়ে দিয়ে। মহাদেবের কাছ থেকে খানিকটা টেনেও নিলেন। দুজনেই এখন ফাঁকায়। বেশ কাছাকাছি।

হঠাৎ সিদ্ধেশ্বর আলো জেবলে আবার সুজনের চোখে ফেললেন। হাত তুলে চোখ আড়াল করল সুজন। রাগে চেঁচিয়ে উঠল। গালাগাল দিল সিদ্ধেশ্বরকে। সিদ্ধেশ্বর আলো নেবালেন।

আলোটা নিবিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে সুজন লাফ মারল।

সিদ্ধেশ্বর সরে যাবার জন্যে নিজেও লাফ মেরেছিলেন কিন্তু পারলেন না, পড়ে গেলেন। বোধ হয় হাতের টর্চ ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। ছোরাটাও।

বরদার তাই মনে হল।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর কোনো রকমে সরে গিয়েছিলেন, সরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেলেন।

সুজন এবার আর ভুল করল না।

সিদ্ধেশ্বরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুজন, পশু যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বরদার গলা দিয়ে আঁতকে ওঠার শব্দ হল। চোখ বুজে ফেলল সে। সিদ্ধেশ্বর যেচে সুজনের হাতে ধরা দিলেন। সুজন ওঁকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। কে যে যন্ত্রণায় ভীষণ চিৎকার করে উঠল তাও বুঝল না বরদা। তার সর্বাঙ্গ অসাড়। হাত-পা ঠাণ্ডা হিম। কপালে তবু ঘাম জমছে। কোনো রকমে চোখ খুলল বরদা। দেখল, সিদ্ধেশ্বর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। কোনো রকমে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। একপাশে হেলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সুজন টলতে-টলতে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না, পড়ে গেল মাটিতে।

কী ঘটল বরদা বুঝল না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বেঁচে আছেন দেখে তার যেন নিশ্বাস পড়ল এতক্ষণে।

ডাক দিলেন সিদ্ধেশ্বর। সতীশকে, বরদাকে।

সতীশ তার মোটর বাইকের হেড লাইট জ্বালিয়ে চোখের পলকে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বরদা ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে গেল।

মোটর বাইকের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট করে। সুজনের গলার পাশ দিয়ে ছোরাটা চলে গেছে। মাটিতে পড়ে আছে সুজন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার গলা। রক্ত চুঁইয়ে কণ্ঠার কাছে নেমেছে, ঘাড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

সুজন মাটিতে পড়ে। শ্বাস টানার শেষ চেষ্টা করছে যেন।

মহাদেবকে আর দেখার কিছু ছিল না। মরে পড়ে আছে। অবিকল টাঙাঅলার মতন। তার মুখ ঘাড়ের দিকে ঘোরানো।

বরদা দু হাতে মুখ ঢাকল।

সিদ্ধেশ্বর সতীশকে বললেন, "আমার বাঁ হাতটা ভেঙে গেছে, সতীশ। কাঁধের কাছ থেকে আর নাড়াতে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বরের বাঁ হাতটা সত্যিই কেমন অদ্ভুত ভাবে দুলছিল, যেন হ্যাঙারে ঝোলানো জামার হাতা ঝুলছে।

সতীশ তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরল সিদ্ধেশ্বরকে।

সিদ্ধেশ্বরের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। বললেন, "ও যদি আমার গলাটা ধরত আমার কী অবস্থা হত, বুঝতে পারছ? কপাল ভাল, আমার গলা ধরতে পারেনি, কাঁধের কাছটায় ধরে ফেলেছিল।" হাঁফাচ্ছিলেন সিদ্ধেশ্বর।

সতীশ বলল, "আপনি যে সুজনের কাছে যাবেন আমি বুঝতে পারিনি।"

"না গেলে কী হত সতীশ, ও বেঁচে থাকত, আরও কত নিরীহ মানুষকে মারত। ও সত্যিই পিশাচ। আমি যে কেন ওকে ভুল করে আমাদের কাছে এনেছিলাম কে জানে! ও আর মহাদেব মিলে আমাদের সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিচ্ছিল।"

সতীশ বরদাকে ডাকল। বলল, "আপনি ও-পাশটা ধরুন। সিধুদাকে গোরুর গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাই আগে তারপর দেখি কী করতে পারি।"

বরদা সতীশের কথামতন এগিয়ে এসে সিদ্ধেশ্বরকে ধরল। তাকাল একবার মহাদেবের দিকে। মরে পড়ে আছে রাস্তায়। হঠাৎ দেখলে, বরদা বলেই মনে হয়।

সুজনও মরছে। চোখের পাতা বুজে আসছে ওর; অসহ্য যন্ত্রণায় তার চোখ মুখ বীভৎস হয়ে উঠেছে। পিশাচের মৃত্যুর মতনই দেখাচ্ছিল।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে বললেন, "আপনাকে আমি বাঁচাতে পেরেছি এ আমার ভাগ্য। কিন্তু কালও আপনার কলকাতায় ফেরা হবে না। থানা পুলিসের একটা ব্যাপার রয়ে গেল। আপনাকে আরও দু-একদিন থাকতে হবে।"

বরদা বলল, "আপনি ভাববেন না। আমি থাকব।"

সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে বরদা আবার ঝিঁঝির ডাক শুনতে পেল। সেই রকম ঝিমঝিমে জ্যোৎস্না, অসাড় গাছপালা। অথচ এমন নিস্তব্ধ, শান্ত, সুন্দর জায়গায় দুটো লোক মরে পড়ে থাকল। এই মাঠে।

বরদার দুঃখই হচ্ছিল। (শেষ)

ছবি মদন সরকার

আগামী সংখ্যা থেকে

বুদ্ধদেব গুহর

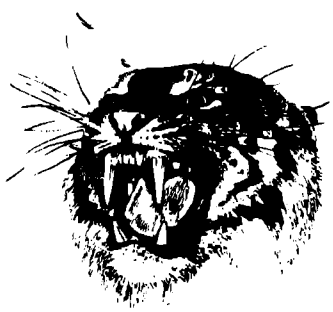

গা-ছমছম-করানো উপন্যাস

বনবিবির বনে

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ১৪ ॥

ভারতীয় দলের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য সফর না করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক হয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়েছিলুম বলে যে-অধ্যাপকরা আমাকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁরা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন, যখন স্যার আশুতোষ ট্রফি জয় করে আমরা ফিরে এলুম। ওই প্রতিযোগিতার প্রতি খেলায় আমার গোল করার কথা উল্লেখ করে অনেকে বললেন, "চুনী না-গেলে আশুতোষ ট্রফি এবারও কলকাতায় আসত না।"

আমি কিন্তু মনে করি, গৌরবময় ওই সাফল্যের মূলে ছিল দলগত সংহতি। প্রতিটি ম্যাচ আমরা খেলেছিলুম একমন একপ্রাণ হয়ে। জয়ের আনন্দের সঙ্গে এই ভেবেই আমি বাড়তি আনন্দ পেয়েছিলুম যে, দূরপ্রাচ্য সফরে না-গিয়ে ঠিক কাজই করেছি। হংকং সিঙ্গাপুর বা ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে দু' চারটি খেলা জিতলে কি এত আনন্দ পেতুম? নাকি যারা আমার কলেজ-জীবনের খেলোয়াড়-বন্ধু তাদের সঙ্গে এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ উপভোগের সুযোগ পেতুম? মনটা আমার প্রশান্তিতে ভরে ছিল।

ক'দিন পরেই খেলতে গেলুম ডুরান্ডে। আমি ১৯৫৭ মরসুমের শেষ দিকের কথা লিখছি। আগের বছর ডুরান্ড থেকে পত্রপাঠ বিদায়ের কথা তো আগেই লিখেছি। এ-বছরও মোহনবাগানকে বিদায় নিতে হল সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে হেরে। খেলাটির কথা এই কারণেই আমার মনে আছে যে, ওই খেলাতেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আমি প্রথম গোল করেছিলুম। প্রথম গোল করেছিলুম মানে যে আমার গোলেই মোহনবাগান এগিয়ে গিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। ইস্টবেঙ্গলই প্রথম গোল করে, তার পর ২—১ গোলে এগিয়ে যায়। আমি দ্বিতীয় গোলটি শোধ করে খেলায় ২—২ গোলে সমতা এনেছিলুম। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আমার বেশি গোল নেই। মাত্র ছয়-সাতটি। তাই ওই প্রথম গোলটির কথা বিশেষ-ভাবেই মনে আছে। খেলার শেষ মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল জয়সূচক গোলটি করে ফাইনালে উঠে যায়।

ডুরান্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। উনিশশো উনষাট থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত সাত বছরের মধ্যে আমরা ছয়বার ডুরান্ড জিতি। সে-কথা বলব যথাসময়ে। আজ শুধু লিখছি, ভারতে যত প্রতিযোগিতায় আমরা খেলেছি ডুরান্ডের সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতার তুলনা করা চলে না। আই এফ এ শীল্ড আমাদের নিজেদের প্রতিযোগিতা। অতীতের বহু স্মরণীয় ফুটবল-যুদ্ধের নানা কাহিনী আমরা শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকে। আই এফ এ শীল্ডের জন্য আমাদের যথেষ্ট গর্ববোধ আছে। কিন্তু ডুরান্ডের ঐতিহ্য, গৌরব, মর্যাদা এবং ব্যবস্থাপনাই আলাদা। আই এফ এ শীল্ডেরও আগে জন্ম ডুরান্ড কাপের। কিন্তু প্রাচীনত্বের কৌলীন্যের জন্য নয়, কিংবা রাজধানীতে খেলা হয় বলেও নয়, ডুরান্ডের মর্যাদার কারণ স্বতন্ত্র। মর্যাদার কারণ কী? কারণ হল নিখুঁত ব্যবস্থাপনা, ঠিক সময়ে খেলা আরম্ভ করা, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ করা। সব কিছু হয় যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে এবং কড়া ডিসিপ্লিনের মধ্যে। সামরিক কর্তৃপক্ষই তো ডুরান্ড কাপের পরিচালক। তাছাড়া প্রতিবছরই ফাইনালে পুরস্কার বিতরণ করতে আসেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। আসেন নৌবাহিনী, পদাতিক বাহিনী ও বিমান বাহিনীর তিন প্রধানও। বিজয়ী দল ডুরান্ড কাপ ছাড়া আর দুটি ট্রফি পায়। যারা সামনা-সামনি দ্যাখেনি, তারা ছবিতে নিশ্চয়ই দেখছ রাষ্ট্রপতির ট্রফি এবং সিমলা ট্রফি দুটি দেখতে কী সুন্দর। এ ছাড়া, ডুরান্ড টুর্নামেন্টের খেলা চলে শীতকালে। ফুটবলের পক্ষে এ হচ্ছে একেবারে আদর্শ আবহাওয়া। ডজ, পাস্, বল-কন্ট্রোল ইত্যাদি যে-সব বিদ্যা একজন খেলোয়াড়কে আয়ত্ত করতে হয়, ডুরান্ডের খেলায় সে-সবকে কাজে লাগানোও যায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে। চমৎকার করে ছাঁটা ঘাস, জমিও নরম নয়, বেশ শক্ত, খেলোয়াড় তাই তাঁর যাবতীয় কৌশলকে এ-মাঠে মোক্ষম-ভাবে খাটাতে পারেন। এ-কথা যেমন অন্যান্য খেলোয়াড়দের পক্ষে, তেমনি আমার পক্ষেও সমান সত্য। এইসব কারণে ডুরান্ডে খেলতে চিরদিন আমি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করেছি।

সে-কথা যাক। ওই উনিশশো সাতান্নর শেষে ডুরান্ড থেকে ফিরে আসার পরই খবর পেলুম, আমাকে ইউনিভার্সিটি টেন্টে গিয়ে ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ডের সম্পাদকের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে বলা হয়েছে। ভেবেছিলুম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছি বলে বোধহয় বিশেষ কোনো পুরস্কার দেওয়া হবে। গিয়ে পুরস্কার পেলুম বটে, কিন্তু হাতে নয়। শুনলুম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা রোহিন্টন বারিয়া ট্রফির খেলাতেও আমাকে সর্বসম্মতভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক করা হয়েছে।

সত্যিই আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কারণ ক্রিকেটে তখন আমার তেমন প্রতিষ্ঠা ছিল না। মোটামুটি ব্যাট করি, বল করি। কলেজে খেলা ছাড়া খেলি দক্ষিণ কলকাতার এক ছোট ক্লাব মিলন সমিতিতে। আমার তখন ধারণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় দলে আর যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা অনেকেই আমার চেয়ে বেশি দিন ক্রিকেটের চর্চায় আছে। আমি যেই মুখ খুলে বলতে গেছি, "স্যার আমাকেই অধি...", স্যার আর কথা বলতে দিলেন না। বললেন, "চুনী, তোমার চেয়ে বয়স আমাদের অনেক বেশি। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, অভিজ্ঞতাও। কাকে দিয়ে কী হবে আমরা তোমার চেয়ে বেশি বুঝি। তুমি কি আগে জানতে সুভাষ গুপ্তের বলের বিরুদ্ধে তুমি হাফ সেঞ্চুরি করতে পারবে?"

হ্যাঁ, তখন গ্রেড ক্রিকেটে সেঞ্চুরির চেয়ে ওই হাফ সেঞ্চুরি ছিল আমার বড় অবদান। অধিনায়ক হয়ে স্যার আশুতোষ ট্রফি জয় করায় কর্তৃপক্ষ হয়তো আমার নেতৃত্বে আস্থাবান ছিলেন। লাকি ক্যাপ্টেন হিসাবেও ভেবে থাকতে পারেন। কিন্তু কোনই সন্দেহ নেই, সুভাষ গুপ্তের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরির ফলেই আমার সামনে ক্রিকেটের বড় দরজাটি খুলে গিয়েছিল।

খেলাটি হয়েছিল দেশপ্রিয় পার্কে, কালীঘাট ও মিলন সমিতির মধ্যে। গুপ্তে তখন খেলেন কালীঘাট ক্লাবে। বিশ্বখ্যাত লেগস্পিনার গুপ্তেকে তখন সমীহ না করতেন এমন ব্যাটসম্যান ছিলেন না। তাঁর বলে পঁচিশ-তিরিশ রান করলেও বড় ব্যাটসম্যানরা বড় কিছু করেছেন বলে মনে করতেন।

কিংবদন্তি লেগস্পিনার সুভাষ গুপ্তে

ঠিক সংখ্যাটি মনে নেই। আমি করেছিলুম বাহান্ন কি তিপ্পান্ন রান। আমি যদি বলি, গুপ্তের লেগব্রেক ও গুগলি বল ঠিক-ঠিক বুঝে আমি রান করেছিলুম, তাহলে একেবারেই মিথ্যে বলা হবে। সত্যি কথা হচ্ছে, আমি তাঁর বল ভালভাবে বুঝতেই পারিনি। খেলেছিলুম কিন্তু কারেক্ট টেকনিকে। একটু অবাক লাগছে, না? ব্যাপারটা কী হয়েছিল শোনো। আমাদের এক খেলোয়াড়-বন্ধু শঙ্কর ব্যানার্জি তখন ছিলেন যাদবপুর কলেজের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। মোটামুটি ভাল ব্যাট করতেন। ক্রিকেট সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। আমরা তাঁকে ক্রিকেট-তাত্ত্বিক বলেই মনে করতুম। এখনো ক্রিকেট নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন। আমার চিরদিনের শুভানুধ্যায়ী। শঙ্করদা বললেন, "দ্যাখ, গুপ্তের বল বুঝতে চেষ্টা করিস না। ওই যে ফুল স্লীভ্‌স শার্ট পরে বল করে, তার কারণ কী জানিস? কব্জি কোন্‌দিকে ঘোরাচ্ছে বুঝতে দিতে চায় না। হাত তো পেছনেই রাখে। তারপর লেগ-ব্রেক দিতে-দিতেই দিয়ে বসে গুগলি। তুই তো তুই, হাজারের মতো ব্যাটসম্যানও গুপ্তের গুগলিতে সময়-সময় বোকা বনে যান। তাই কখনো বুঝতে চেষ্টা করবি না—কোন্‌টা লেগ-ব্রেক দিচ্ছে, কোন্‌টা দিচ্ছে গুগলি। বুঝতে গেলেই তিন কাঠি ফাঁক হয়ে যাবে। না-হয় ব্যাট ছুঁয়ে বল যাবে উইকেট-কীপারের গ্লাভসের মধ্যে। কিংবা এল বি হয়ে যাবি। শুধু উইকেট গার্ড করে ব্যাট চালাবি। বল পিচে পড়ার পর ভালভাবে লক্ষ করবি লেগের দিকে টার্ন নিচ্ছে, না অফের দিকে টার্ন নিচ্ছে। সেইভাবে ব্যাট চালাবি। হাতে যখন স্ট্রোক আছে, লুজ-বল মারতে দ্বিধা করবি না। উইকেটে থাকলেই রান আসবে।"

শঙ্করদার এই উপদেশ-মতো খেলেই আমি গুপ্তের বলের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরি করেছিলুম এবং সেই ঘটনা নিয়ে দেশপ্রিয় পার্কে একটা মিনি ব্যাট্‌লও হয়ে গিয়েছিল। সে-কথায় পরে আসছি। তার আগে, আমার মনে হয় ওই লেগ-ব্রেক ও গুগলির পার্থক্যটা তোমাদের কাছে বলা দরকার।

লেগ-ব্রেক হচ্ছে—যে বল লেগ সাইডের স্টাম্পের দিকে পড়ে অফসাইডের স্টাম্পের দিকে ঘুরে যায়। অফ-ব্রেক হচ্ছে এর উল্টো। অর্থাৎ অফ সাইডে বল পড়ে লেগ সাইডে টার্ন করে। আর গুগলি হচ্ছে, লেগ-ব্রেক বল করার কায়দায় অফ-ব্রেক করানো। তুমি হয়তো দেখছ, বোলার লেগ-ব্রেক করাচ্ছে, একই-ভাবে হাত ঘোরাচ্ছে, ভাবছ বল লেগের দিকে পড়ে অফের দিকে ঘুরবে; কিন্তু তোমাকে বোকা বানিয়ে বল অফের দিকে পড়ে লেগ স্টাম্প নিয়ে চলে গেল। কীভাবে এটা হয়? ডান-হাতি বোলারের কব্জি ঘোরানোর কায়দায়।

বিখ্যাত ক্রিকেটার কার্তিক বসু ছিলেন গুগলি বলের মাস্টার। কার্তিকদা বহুদিন বোম্বাইয়ে ছিলেন। ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়ায় খেলেছেন বহুদিন নিয়মিত। আমরা শুনেছি, আর-এক বিখ্যাত ক্রিকেটার বিজয় মার্চেন্ট বোম্বাইয়ের ছেলেদের বলতেন, "যাও, কীভাবে লেগ-ব্রেক ও গুগলি খেলতে হয়, কার্তিক বসুর কাছ থেকে শিখে নাও।"

কার্তিকদা নিজে আমাদের বলেছেন—গুগলি কী জানিস? One that pops out from the back of the palm in a leg-break delivery is a 'Googly'। অর্থাৎ লেগ-ব্রেক বল করার অ্যাকশানে চিত-করা হাতের তালু থেকে যে বল বের হয় তাই হচ্ছে গুগলি। লেগ-ব্রেকের বদলে বল হয়ে যায় অফ-ব্রেক।

এখন নিশ্চয়ই লেগ-ব্রেক ও গুগলির পার্থক্যের কিছুটা আন্দাজ পেলে। এবং একই অ্যাকশানে কীভাবে এই বল করা হয় তাও বুঝতে পারলে। এটা একটা বড় আর্ট। সুভাষ গুপ্তে

কার্তিক বসু। 'গুগলি'কে জব্দ করে দিতেন

ছিলেন এই আর্টের মস্ত বড় শিল্পী।

এখন সেই মিনি ব্যাটলের কথা শোনো। অতবড় বোলার, অথচ আমাকে আউট করতে পারছেন না। আমি ব্যাট দিয়ে উইকেট গার্ড করে খেলে যাচ্ছি। পায়ে বল লাগলেই গুপ্তে এল-বি-ডবলিউর আবেদন জানাচ্ছেন। দু-তিনবার আবেদন জানাতেই পাড়ার ছেলেরা গুপ্তেকে উপহাস করতে আরম্ভ করল। আমারই তো পাড়া। ফুটবলের জন্য তখন পাড়ায় আমার জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট। গুপ্তের বলে আমি কারেক্ট টেকনিকে খেলছি বলে হাততালিও পাচ্ছি স্ট্রোকের সঙ্গে-সঙ্গে। আর গুপ্তে খেপে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হল, গুপ্তে বেসামাল হয়ে পড়লেন। এল-বি-ডবলিউয়ের আবেদন নাকচ হবার সঙ্গে-সঙ্গে যেই সমস্বরে গুপ্তের বিরুদ্ধে টিটকিরিধ্বনি আরম্ভ হল, তিনি কটি ছেলের দিকে তেড়ে গেলেন। সবাই মিলে তখন গুপ্তেকে মারে আর কী। আমিই তাদের থামিয়ে দিলুম। বহুদিন গুপ্তে আমার সঙ্গে কথা বলেননি। দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। কথা হল তিন বছর পর। তাও ভারতে নয়, লন্ডনের চ্যারিংক্রসে। কলকাতার যেমন এসপ্ল্যানেড, লন্ডনের তেমন চ্যারিংক্রস সদা-কর্মচঞ্চল স্থান। এটা ১৯৬০ সালের কথা। রোম অলিম্পিক থেকে আমি এসেছিলুম লন্ডনে বেড়াতে। গুপ্তে আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন এবং লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি তো মহা খুশি। পয়সা পকেটে বেশি ছিল না, সেদিনের খরচটাও বেঁচে গেল।

দ্যাখো, কোথা থেকে কোথায় এলুম। ইউনিভার্সিটি টেস্ট থেকে দেশপ্রিয় পার্ক, সেখান থেকে একেবারে লন্ডনে। খেলার কথা লিখতে-লিখতে কত কথাই মনে পড়ে যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন হবার পর পড়লুম দুটি সমস্যায়। আগেই লিখেছি, আমার চেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় দলে ছিলেন। আমি অধিনায়ক হয়েছি বলে তাঁদের কেউ-কেউ যেন তেমন খুশি হতে পারলেন না। আজ লিখছি, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই নয়, পরে যখন আমি বাংলার ক্রিকেট টীমে আসছি, তখনও কেউ-কেউ বলেছেন, "বড় ফুটবলার বলে ক্রিকেটেও খেলতে হবে যদিও এঁদের সংখ্যা খুবই কম। যাই হোক, আমার দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দলের ম্যানেজার ফাদার লিমিং ও সহ অধিনায়ক দেভিত্রিকে নিয়ে। দুজনই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের। একজন অধ্যাপক, একজন ছাত্র। আমি ছাত্র আশুতোষ কলেজের। ওঁদের জিভে-জড়ানো ইংরেজির সঙ্গে পরিচিত নই। আমাদের তিনজনকে নিয়ে আবার নির্বাচক কমিটি। তাই প্রথম দিকে কথা বুঝতে একটু অসুবিধা হয়েছিল বই কী!

আমাদের খেলার ফল কিন্তু খারাপ হল। এলাহাবাদে বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রথম খেলাতেই আমরা হেরে গেলুম। জান্‌জি নামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দলে এক ফাস্ট বোলার ছিল। বেশ ফাস্ট। টেস্ট-ক্যাম্পেও তার ডাক পড়েছিল। দলের ব্যর্থতা আমার মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবে আমার নিজের নট-আউট ৭৬ রানের উপর অনেকেই একটি ছাপ মেরে দিয়েছিলেন, "এ ফাইন ক্যাপ্টেন'স নক।"

পরের বছর রোহিন্টন বারিয়া ট্রফিতে অবশ্য আমরা অনেক ভাল খেলেছিলুম। তখন খেলা হত উত্তর ও দক্ষিণ দুই অঞ্চলে। আমরা উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে হেরে গিয়েছিলুম দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। কিন্তু সেমিফাইনালে দারুণ খেলেছিলুম বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। যতদূর মনে পড়ছে, আমরা সাড়ে আটশোর উপর রান করেছিলুম। ৮৫৭ কি তার কাছাকাছি সংখ্যা হবে। আমাদের প্রথম চারজন বড়ুয়া, সলিল বানার্জি, শ্যামসুন্দর মিত্র ও আমি সেঞ্চুরি করেছিলুম। পঞ্চমজন পি সি পোদ্দার সেঞ্চুরি পায়নি মাত্র ৯ রানের জন্য। ৯১ রান করে আউট হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণ মিত্র এবং গোপাল চক্রবর্তীও ভাল খেলেছিল। আমাদের উপাচার্য নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এত খুশি হয়েছিলেন যে, আমাদের চারজনকে চারখানা বিলিতি ব্যাট তো উপহার দিয়েছিলেনই, পি সি পোদ্দারকেও দিয়েছিলেন একই ধরনের বিলিতি ব্যাট।

আমি জানি না, আজও রেকর্ড খতিয়ে দেখিনি, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সাড়ে আটশো রান আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে দলগত বড় রানের রেকর্ড কিনা।

ক্রিকেটের কথা লিখছিলুম বলেই ১৯৫৮ মরসুমের ক্রিকেটের কথাটা সেরে নিলুম। আটান্নয় কলকাতার ফুটবল মরসুমে ছিল খুবই রমরমা অবস্থা। সব দলেই প্রচুর ভাল খেলোয়াড় ছিল এবং সামনে ছিল টোকিও এশিয়ান গেমস।

কোচিং-ক্যাম্প পরিচালনার প্রশ্নে ফুটবল ফেডারেশনের তখন কাকে রেখে কাকে ডাকি—এই চিন্তা। শুধু কলকাতা নিয়েই তো ভারতের ফুটবল নয়।। অন্যান্য রাজ্যেও নামী খেলোয়াড়ের অভাব ছিল না। কিন্তু বলা যেতে পারে কলকাতাই ছিল তখন ফুটবলে চাঁদের হাট। জাপানকে বলা হয় উদিত সূর্যের দেশ। দ্যাখোনি ওদের জাতীয় পতাকায় উদিত সূর্যের ছবি? সেই সূর্যের দেশে যাবার জন্য চাঁদের হাটে তখন বাঁধভাঙা উত্তেজনা।

(ক্রমশ)

প্রভাবতীর স্বপ্ন

হেমন্তবালা দেবী

এক দরিদ্র গৃহস্থের একটি মাত্র কন্যা, প্রভাবতী। তার মা-বাবা এতই গরিব যে, মেয়ের গায়ে গহনা দিতে পারে না। মেয়ে অমনি থাকে। একদিন সে নদীর ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখল, ঘাটে একটা নৌকো এসে লেগেছে, সেই নৌকোয় কয়েকটি বৌ-ঝি বসে আছে। তাদের হাতে সোনার কঙ্কণ। এই দেখে এসে মেয়ে বায়না ধরল, তার অমনি অলঙ্কার চাই। মা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়েও মেয়েকে ঠান্ডা করতে পারে না। তখন রাগ করে তার গালে চড় মারতেই মেয়ে কেঁদে উঠল।

বাপ গিয়েছিল বাগানে, শাকের খেতে জল দিতে। মেয়ের কান্না শুনে ছুটে এসে মেয়েকে কোলে করল। মেয়েকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে সে নিজের কাঁধের গামছাখানি দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। এই গামছাই তারা নিজেরা বুনে পরে, গায়ে দেয়, মেয়েকেও পরায়। ছোট্ট একখানি খেতে কাপাস হয়। প্রভাবতীর মা সুতো কাটে, সুতো রঙ করে, প্রভাবতীর বাবা গামছা বোনে।

প্রভাবতীর কান্না দেখে তার বাপের যেন বুক ফেটে গেল। সে একখানি নতুন গামছা নিয়ে বাজারে গিয়ে বিক্রি করে যা পয়সা পেল তাই দিয়ে ঘরের দরকারী জিনিস কিনে নিয়ে আসার সময় এক ময়রার দোকানে গিয়ে দুখানা জিলিপির বায়না দিল। যেন জিলিপি দুখানা শক্ত হয়। তাতে যেন মটরদানার মতো থাকে আর হাতে পরা যায়। ময়রা সেই রকম করে এক জোড়া জিলিপি করে দিল।

প্রভাবতীর বাবা সেই জিলিপি দুখানা মেয়ের হাতে পরিয়ে বলল, "মা, এই তোমার সোনার কঙ্কণ।" প্রভাবতী মনের আনন্দে তাই পরে সমবয়সীদের সঙ্গে নদীর ধারে গাছতলায় খেলা করতে গেল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা দুষ্টু ছেলে ছিল। সে আর-সবাইকে ঐ জিলিপি দেখিয়ে দিতেই সবাই হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। একজন বলল, "ও প্রভা, ও দুটো আমাকে দে না। তোকে দু-পণ কড়ি দেব।"

আর একজন বলল, "ইশ! ওর আবার দু-পণ দাম হয় নাকি! এক পণ দিলেই ঢের হল।"

কেউ বলল, "ও প্রভা, ও দুটো খেয়ে ফেল না! পিঁপড়ে লেগে যাবে যে!"

এইরকম সকলে ঠাট্টা-তামাশা করছে, এমন সময় এক চিল উড়ে এসে একটা জিলিপি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। ওর হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল।

অন্য জিলিপিটা ঐ দুষ্টু ছেলেটা কেড়ে নিল।

প্রভাবতী আবার কাঁদতে-কাঁদতে বাপের কাছে গেল। বাপ তার হাতে দুবোর রস দিয়ে কানি বেঁধে দিয়ে বলল, "কাঁদিস নে প্রভা, এবার তোকে এমন কঙ্কণ এনে দেব যে, আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।"

শিশুদের—কিশোরদের—যত ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
মহাসংকটে শঙ্কু ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০

বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও মন্মথ চৌধুরী
নিশীত রাতের আহ্বান ৩·০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হম্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
মউজির রাত ৫·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০

সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ৩·০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০

সুকুমার রায়

বাংলা সাহিত্যে একাই একটি প্রতিষ্ঠান। একা এবং অনন্য। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনা ও ছবির বিপুলায়তন সংগ্রহ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র।' যে-কোনও বয়সী পাঠকই অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করবেন অমূল্য এই সংগ্রহ নিজস্ব ভাণ্ডারে রাখতে। দু-খণ্ড বেরিয়েছে, তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। সম্পাদনা করেছেন সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু। সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশুসাহিত্য আবার আলাদাভাবে অতি সুলভ মূল্যে একটি মাত্র খণ্ডেও পাওয়া যায়। আরেকটি অভিনব রচনা সংকলন—'জীবজন্তু।'

সুকুমার রায়ের গ্রন্থ ঃ

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম খণ্ড) ২৫.০০ সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য় খণ্ড) ৩০.০০ জীবজন্তু ৮.০০ সমগ্র শিশুসাহিত্য (অখণ্ড) ১০.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৫·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও
দিনে ডাকাতি ৬·০০
সবুজদ্বীপের রাজা ৫·০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০

সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০

নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ ক্রিস্ট্যাল ১০·০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার স্নেক ৪·০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০

অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০

গিরিধারী কুণ্ড
টংসা চু ৫·০০

সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রধনি ৫·০০

বিমল মিত্র
রাজা হওয়া ঝকমারি ৭·০০

শিশিরকুমার মজুমদার
তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০

অন্নদাশংকর রায়
হৈ রে বাবুই হৈ ৫·০০

মঞ্জিল সেন
ডাকাবুকো ৫·০০

রেবন্ত গোস্বামী
অরুমিতুদের কথা ৪·০০

শিশির কর
গলায় বাঘ ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

প্রভাকে অনেক করে সান্ত্বনা দিয়ে তার বাপ এক সের চিঁড়ে আর এক পোয়া গুড় গামছায় বেঁধে, একটা লাঠি আর একটা ঘটি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রভাবতীর মা প্রভাকে গাল দিয়ে বলল, "গয়না পরার লোভে বাপকে তাড়ালি! এখন খাবি কী! কে কড়ি আনবে, কে বাজার করে দেবে?"

প্রভাবতীর বাপ চলে গেল, আর মা বকল, তাই সে মনের দুঃখে নদীর ঘাটে বসে চোখের জল ফেলতে লাগল।

সেই নদীতে ছিল এক জলদানব। প্রভাবতীকে দেখে তার মায়া হল। সে গিয়ে বলল জলের রাজাকে, "একটি ছোট মেয়ে ঘাটে বসে কাঁদছে, তার হাতে ছেঁড়া কানি দিয়ে ওষুধ বাঁধা।"

এখন জলের রাজার একটি মেয়ে আছে, তার খেলার সঙ্গী নেই কেউ। জলের রাজা তখুনি একটা মস্ত বড় মাছের রূপ ধরে এসে প্রভাবতীকে দেখল। প্রভাবতীকে দেখে তার পছন্দ হল, বড় মায়া হল। সে তখন একটা পদ্মপাতার উপরে এমন করে জলের রেখা এঁকে দিল যে, তার উপর রোদ পড়ে ঠিক সোনার কঙ্কণের মতো ঝিক ঝিক করতে লাগল। সেদিকে প্রভাবতীর চোখ গেল।

প্রভাবতী ভাবল, "এই তো দিব্যি কঙ্কণ রয়েছে, আমি তুলে আনি।" বলে যেমনি সে জলে পা বাড়িয়েছে, অমনি সেই জলের রাজা ওর পা ধরে ওকে টেনে নিয়ে গেল গহিন গাঙে। প্রভাবতী কাঁদতেও সময় পেল না।

জলের রাজা তাকে যেখানে নিয়ে গেল, সেটি হল একটি প্রবালের দ্বীপ। সাত সমুদ্র পেরিয়ে মহাসমুদ্র, সেই মহাসমুদ্রের মাঝখানে অনেক সাদা লাল ধোঁয়াটে রঙের পলা জমে তার উপর শ্যাওলা গজিয়েছে। পাখিরা উড়ে-উড়ে সাগর পার হবার সময় সেই দ্বীপে এসে বসে। কেউ বা শ্যাওলা খায়, তাদের পালক খসে পড়ে। কেউ বা সেখানে ডিম পাড়ে। বাচ্চা হয়, উড়ে যায়, ডিমের খোলা পড়ে থাকে। পাখিদের জন্যেই সেখানে বটগাছের মতো বড়-বড় গাছের পাকা ফলের বীজ এসে জোটে। সেই ফলের বীজ থেকে গাছ হয়। এমনি করে যুগ-যুগ ধরে পাখিরা সেখানে একটি বনজঙ্গল বানিয়ে ফেলেছে। জলের রাজা সেই-খানে প্রভাবতীকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

প্রভাবতী অজ্ঞান হয়েছিল। রোদ লেগে তার জ্ঞান হল। সে প্রথমে কাঁদল। তার পরে বুঝল, এখানে সে একা। তাকে বাঁচতে হবে। সে খানিক শ্যাওলা আর ঢেঁকি-শাকের মতো শাক তুলে কোমরে জড়িয়ে কাপড়খানি নিংড়ে রোদে শুকোতে দিল। কাপড় শুকোলে সেই কাপড় পরে ঘুরতে-ঘুরতে দেখল, এক জায়গায় পাখির ডিম রয়েছে দুটি। সে ভাবল বালির ভিতরে ডিম দুটি রাখলে রোদের তাপে হয়ত সিদ্ধ হবে। এই ভেবে ডিম দুটি হাতে করে, সমুদ্রের ধারে এসে বালি খুঁড়ে ডিম দুটি চাপা দিয়ে রাখল। তারপর আবার ঘুরে দেখতে লাগল কোথাও কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা। খাবার আর থাকবে কোথায়! কয়েকটি গাছে পাকা ফল আছে, কিন্তু সে ফল খাওয়া যায় কি না, তা তো সে জানে না। আর উঁচু উঁচু ডালে ফলেছে, পাড়বেই বা কেমন করে?

এমন সময় দেখল, একরকম ফল অনেক খসে পড়ে আছে মাটিতে। পাখিরা খেয়েছে কিছু-কিছু। সে ঐ পাখির খাওয়া ফল তুলে এনে একটু মুখে দিয়ে দেখল, দিব্যি পাকা আমের মতো মিষ্টি তো! সে ঐ ফল খেতে লাগল।

এদিকে সেই ডিম দুটো ফুটে গিয়ে বাচ্চা বেরিয়েছে। তাদের মা-বাপ ডিম দেখতে না পেয়ে চেঁচামেচি বাধিয়েছিল, ঐ বাচ্চা-দুটো চিঁ-চিঁ করে সাড়া দিল। পাখিরা উড়ে এসে বাচ্চা দুটি পেয়ে খুব খুশি। তারা বাচ্চা নিয়ে আনন্দে বাসায় ফিরে গেল। এদিকে প্রভাবতী এসে দেখে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে চলে গেছে।

সে হতাশ হয়ে বসে ভাবছে 'কী করি'! এমন সময় জল তোলপাড় করে জলের রাজা এল। এবার তার মাথায় সোনার মুকুট। অর্ধেক অঙ্গ মানুষের, অর্ধেক মাছের মতো—এই রূপ ধরে সে এসেছে।

সে এসে বলল, "দেখো মেয়ে, তুমি দুঃখ করো না। আমি এই জলের রাজা, জলের নীচে আমার ঘর। আমার একটি মেয়ে সঙ্গী না পেয়ে খেলা করতে পায় না, তাই আমি তোমাকে এখানে এনেছি। এখুনি আমার মেয়ে আসবে তোমাকে নিতে, তার কোলে চড়ে তুমি আমার ঘরে যেতে পারবে। তোমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।"

প্রভাবতী বলল, "আমার বাবা বাড়িতে নেই, আমার মা একা। আমি বাড়ি যাব।"

জলের রাজা বলল, "যদি আমার মেয়ে যেতে দেয়, তবে যাবে।"

এই বলে জলের রাজা সমুদ্রে তলিয়ে গেল। আর, চমৎকার একটা বাজনার সুরের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে, আলোর জৌলুস ছড়িয়ে, এক পরমা সুন্দরী মেয়ে দেখা দিল। তারও অর্ধেক অঙ্গ মানুষের, অর্ধেক অঙ্গ মাছের।

সে বলল, "ওগো মেয়েটি, তোমার নাম কী?"

প্রভাবতী ঐ মেয়েটিকে দেখে তার রূপে আর মিষ্টি কথায় সমস্ত ভয় দুঃখ ভুলে গেল। সে বলল, "আমার নাম প্রভাবতী। তুমি কে? তুমিই কি জলের রাজার মেয়ে?"

সে হেসে বলল, "না গো না! আমার নাম প্রবালী, আমি জলপরী। জলের রাজার মেয়ে জলকুমারীর সঙ্গে আমার আড়ি! ও তোমাকে এক্ষুনি নিতে আসবে! ওর সঙ্গে যাও যদি, তবে তুমি কোনোদিন বাড়ি ফিরতে পারবে না।"

প্রভাবতী বলল, "তবে আমি করি কী।"

প্রবালী বলল, "তুমি গয়না পরতে চাও তো? আমি তোমাকে প্রবালের গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি। তুমি কাপড় পরতে চাও তো? আমি মাছের আঁশ দিয়ে কেমন সুন্দর-সুন্দর পোশাক তৈরি করেছি। তুমি আমার সঙ্গে এসো, তোমাকে আমি বাড়ির ঘাটে পৌঁছে দেব।"

প্রভাবতী বলল, "তুমি আমার জন্যে এত করবে কেন?"

ডায়মণ্ডহারবার

বাসুদেব দেব

ডায়মন্ড হীরে আর হারবার বন্দর
এইখানে হীরে পাবে হন্দর হন্দর।
রেলে না লরিতে নেবে
জাহাজে না নৌকায় ?
আছে সব ডাঁই করা
একশোটা চৌকোয়।
কত টাকা ? আজকাল আছে কিছু কম দর
আড়তে অনেক বালি আমাদের নন্দ'র।

জলপরী বলল, "আমার যে জলকুমারীর সঙ্গে আড়ি। আমরা একসঙ্গে খেলতাম। আমার একটি শাঁখের খেলনা ছিল, সেটি ও ভেঙে ফেলেছে, তাই ওর সঙ্গে আমার আড়ি। ও আমাকে ছেড়ে তোমার সঙ্গে খেলবে, এ আমি সইব না! ও আগে আমায় ঠিক সেইরকম শাঁখের খেলনা এনে দেবে, আর আমার সঙ্গে খেলা করতে চাইবে, তবে আমার আড়ি ভাঙবে।"

প্রভাবতী বলল, "আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহলে ও রাগ করবে না? মেরে ফেলবে না আমাকে?"

বলতে না বলতেই সাগরে যেন ঝড় উঠল। পাহাড়-পর্বতের মতন মস্ত-মস্ত কালো রঙের ঢেউ; সেই ঢেউয়ের ভিতর থেকে একটি মেয়ে উঠে এল। তার গায়ে সবুজ শ্যাওলার পোশাক, তারও অর্ধেক অঙ্গ মানুষের, অর্ধেক অঙ্গ মাছের মতো। সে এসে ঝোড়ো হাওয়ার মতো রাগী আওয়াজে বলল, "প্রবালী, তুই আবার আমার সঙ্গে লেগেছিস! আমি যখনি একটা মানুষের মেয়েকে কুড়িয়ে আনি, তখনি তুই বাগড়া দিস! জানিস নে কি জলদেবী রাগ করেছেন পুজো না পেয়ে?"

প্রবালী বলল, "ও সর্বনাশ! তাই তুমি খেলার নাম করে মিছিমিছি ভুলিয়ে আনো মানুষের মেয়েদের! আমি তা জানতাম না। আমি তোমার খেলার সঙ্গী আর কাউকে রাখব না বলে তাই তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসতাম। তুমি জলদেবীর কাছে বলি দেবে মেয়েটিকে? তুমি তো ভয়ংকর দেখছি! তাহলে আমি তো কখনোই ওকে তোমার হাতে দেব না।"

এই বলে সেই সমুদ্রের জলে দুজনে লড়াই শুরু করে দিল। সাগর তোলপাড় করতে লাগল ওদের লেজের আর পাখনার ঝাপটায়। এই না দেখে ভয় পেয়ে প্রভাবতী প্রবাল-দ্বীপের মাঝখানের জঙ্গলে ছুটে পালিয়ে গেল। সেখানে সেই পাখির বাচ্চা দুটো ছিল। তাদের মা তাদের আদর করে খাইয়ে দিচ্ছে। প্রভাবতীকে দেখে একটা বাচ্চা বলল, "দ্যাখো মা, এই মেয়েটি আমাদের প্রাণ দান করেছে!. ও না এলে জলজন্তু উঠে এসে ডিম খেয়ে ফেলত! এ আমাদের বালি চাপা দিয়েছিল, তাই রক্ষে পেয়েছি।"

মা-পাখি বলল, "এই মেয়েটিকে বুঝি জলের রাজার ভাল লেগেছে? জলের রাজা খুব ভাল। কিন্তু তার মেয়ে যে কত হিংসুটে খুনে, তা তো জানে না।"

বাচ্চারা বলল, "মা, তুমি একে বাঁচাও না।"

মা বলল, "আমি সামান্য পাখি, আমি এর কী উপায় করব! আসুক তোদের বাপ, দেখি—সে কী বলে।"

প্রভাবতী সব শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে সেইখানে এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে রইল। এদিকে দুই মেয়ের ঝগড়া দেখে জলের রাজা উঠে এসেছে। সে দুজনকেই থামাবার চেষ্টা করছে। তখন প্রবালী বলে দিল, তার মেয়ের কুমতলবের কথা। তাই শুনে জলের রাজা বলল, "সে কী! সত্যি তুই এই মেয়েটাকে জলদেবীর কাছে বলি দিতে চাস!"

মেয়ে বলল, "তুমিই তো বলেছ—জলদেবীকে একটি মানব-কন্যা দিলে তিনি খুশি হয়ে আমাদের ধন-দৌলত বাড়িয়ে দেবেন!"

রাজা দুঃখ করে বলল, "ছি মা! ধন-দৌলত আর কী হবে! তা বলে তুই অমন সুন্দর মেয়েটিকে মেরে ফেলবি! তা হয় না। তোর ও মতলব ছাড়।"

প্রবালী বলল, "আমি কিছুতেই ওকে অন্য খেলুড়ির সঙ্গে খেলতে দেব না।"

জলকুমারী বলল, "বাবা, আমি ঐ মেয়েটিকে মানত করেছি জলদেবীর কাছে, মানত না পেলে জলদেবী রাগ করবেন না?"

রাজা বলল, "আচ্ছা, সে আমি দেখছি! কই, মেয়েটি গেল কোথায়?" তাই তো! প্রভাবতী তো সেখানে নেই। অথচ জলের রাজা ডাঙায় উঠতে পারে না।

এদিকে গেরস্ত-পাখি এসে পড়েছে। সে সব কথা শুনে বলল, "ওগো মেয়েটি, তোমাকে আমি জিয়ৎ গাছের ফল এনে দিচ্ছি, তুমি খাও, আর আমার ডানার তিনটি পালক খোঁপায় গুঁজে তুমি সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াও, তোমার ভাল হবে। তোমার কোনো ভয় থাকবে না।"

এই বলে পাখি তাকে তিনটি ফল এনে খেতে দিল। আর, ডানা থেকে তিনটি পালক খসিয়ে দিল।

প্রভাবতী ফল খেতে গিয়ে দেখল ফলগুলো ভারী বিস্বাদ। অনেক কষ্টে সে তিনটিই খেল বসে বসে। বলল, "আমাকে একটু মিষ্টি দাও না। আমার মুখ তেতোয় আর কষায় বিশ্রী লাগছে।"

পাখি বলল, "ওটুকু সহ্য করো। মিষ্টি খেয়ে কাজ নেই।"

তারপরে প্রভাবতী এলো খোঁপা বেঁধে সেই পাখির পালক খোঁপায় পরে জলের ধারে আসতেই জলের রাজা এসে বলল, "এই যে মা, তুমি এসেছ! আমার কোলে চড়ো দেখি!" এই বলে জলের রাজা ওকে কোলে করতেই জল দু ফাঁক হয়ে গেল। তার ভিতরে কত যে সুন্দর-সুন্দর নানা রঙের ফুলের মতো, কত যে শোভা তার, সে আর কী বলব! সেই ফুলের ভিতর দিয়ে জলের রাজা ওকে এক আশ্চর্য জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে কেবলই নানা রঙের আলো আর নানা রঙের মাছ ঝিনুক শামুক শঙ্খ আরও কত রকম-বেরকম জলের জীব! আর, কত রকমের শ্যাওলা! রঙিন কাচের মতো পাথর আর রকমারি প্রবাল পড়ে আছে।

সেইখানে এক রঙিন পাথরের পাহাড়ের গুহায় জলের রাজা ওকে নিয়ে গেল। তার চারধারে কী সুন্দর বাগান, কী সুন্দর ফুল, আর ফুলের সে কী সুগন্ধ! আর, কত রকমের বাজনার সুর শোনা যাচ্ছে! জলের রাজা ওকে একটা আলোর বেদীর কাছে নিয়ে গেল। বলল, "এই বেদীতে তুমি বোসো।"

অমনি আলোর বেদী পাথরের বেদী হয়ে গেল। প্রভাবতী তার উপরে বসল। তখন আকাশ থেকে এক দেবী নামলেন। তিনি জলদেবী। তিনি এসে প্রভাবতীকে কোলে করে চুমো খেয়ে তার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। প্রবালী আর জলকুমারী দুদিকে দাঁড়িয়ে ভয়ে-ভয়ে তাঁকে দেখছে। জলদেবী প্রভাবতীর গলায় সাদার উপর নানা রঙের আভা-দেওয়া একগাছি সুগন্ধি গোলাপের মালা পরিয়ে দিলেন। দু হাতে গোলাপের কঙ্কণ। মাথায় গোলাপের মুকুট। কোমরে গোলাপের কোমরবন্ধ। পায়ে সবুজ শ্যাওলার জুতো আর কুমুদ-নালের দু-ফের মল।

দেবী প্রভাবতীর মুখে একটি মিষ্টি ফল দিয়ে বললেন, "এটি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো তো! লক্ষ্মী মেয়েটি! আমি মা, আমি কি মারতে পারি কাউকে!"

প্রভাবতী তাঁর কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

"প্রভাবতী, ওঠো মা!"

"ও প্রভা! ও প্রভা! ওঠ না! তোর বাপ কত ডাকাডাকি করছে।"

মা বাপের ডাকে প্রভাবতী জেগে উঠে বসল। দেখে, এতক্ষণ সে নদীর ঘাটের বাতাসে শুয়ে শুয়ে স্বপন দেখছিল। বেলা পড়ে গেছে।

তার বাবা বললেন, "এই নে মা, তোর কঙ্কণ! তোর গরিব বাপের যা সাধ্য!" শহরে গিয়ে ঘটি বেচে বাপ দুটি পিতলের কঙ্কণ গড়িয়ে এনেছে। প্রভা তা জানে না। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, ফুলের কঙ্কণ আর মৃণালের মল ভাল না এই ভাল!

ওর মা ওকে কোলে করে চুমো খেল।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

চিঠি

আমি দুর্গাপুরে থাকি। আমি মাসিক আনন্দমেলার গ্রাহক। এই পত্রিকাটি আমি খুব ভালবাসি। আমাদের বাড়ির সকলের পড়া হয়ে গেলে আমার বন্ধু গৌতম পত্রিকাটি নিয়ে যায়। মাসিক আনন্দমেলা তারও খুব ভাল লাগে। এক সপ্তাহের মধ্যে সকলের পড়া হয়ে যায়। পরের সংখ্যার জন্যে তখন অপেক্ষা করতে হয়। মনে হয়, দীর্ঘদিনের অপেক্ষা। আচ্ছা, এই পত্রিকাটি পাক্ষিক করেন না কেন?
সুবীর পাল (বয়স-১৫)

আমরা মাসিক আনন্দমেলা নিয়মিত পড়ি। আমি ভালবাসি উপন্যাস, দিদি ভালবাসে কমিক্স। পত্রিকার নতুন সংখ্যা হাতে এলে সবাই কাড়াকাড়ি করে পড়ার জন্যে। নতুন আনন্দমেলা দশদিনের মধ্যেই পুরনো হয়ে যায়। তাই আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, এই জনপ্রিয় পত্রিকাটিকে পাক্ষিক করুন।
সমীর মজুমদার (বয়স-১১)
রত্না মজুমদার (বয়স-১৩)

মাসিক আনন্দমেলা আমার খুব ভাল লাগে। এরকম পত্রিকা আমি আগে একটাও দেখিনি। পত্রিকাটির জন্যে একমাস ধরে অপেক্ষা করে থাকতে ভাল লাগে না। আনন্দমেলা মাসে দুটো করে ছাপতে পারেন না?
ইন্দ্রনীল দত্ত (বয়স-১৩)

ভয়

পরশু সন্ধ্যায় আমাদের পাড়ায় লোডশেডিং হয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুতে কলঘরে গিয়েছিলাম। হঠাৎ জানলার দিকে চোখ পড়তে দেখি ঘসা কাচের ওপারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভয় পেয়ে মাকে ডাকতে গেলাম কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আমার দেরি দেখে মা কলঘরে ঢুকে বললেন, "কী রে, চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন?"

আমি তখন মাকে বললাম, "বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে।"

মা লণ্ঠন তুলে দেখে হেসে বললেন, "ওটা তোমারই ছায়া। আলো-আঁধারিতে ওইরকম দেখাচ্ছে।" তখন আমিও হেসে ফেললাম।
রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স—৮)

হাবুবাবু

এক যে ছিল বাবু
তাকে করত সবাই কাবু
খেত দুধসাবু
হাবু নামের বাবু
সৌরভ মুখোপাধ্যায় (বয়স-১)

গভীর রাতের রহস্য

কিছুদিন আগে বাবা-মা কী কাজে বেনারস গিয়েছিলেন। ঘরে আমি, দিদি আর ঠাকুমা ছিলাম। সেদিন রাত্রে আমি একলা একটা ঘরে শুয়েছিলাম।

একটু পরে আমার ভয় লাগল। আমি ঠাকুমাকে ডাকলাম। ঠাকুমা আমার পাশে এসে শুলেন।

গভীর রাত্রে আমার দুই কাকু—কল্যাণকাকু, মুকুলকাকু আর পাশের বাড়ির জেঠু এলেন। তাঁরা বাইরের ঘরে বসলেন। তাঁরা কী রকম সর্দি ধরা গলায় কথা বলছিলেন। একটু পরে কে আবার কড়া নাড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে?" বাইরে থেকে একজন খোনা সুরে উত্তর দিল, "আমি।" তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম। কেউ নেই। ভয় পেয়ে আমি ঘরে ঢুকে দেখি, আমার দুই কাকু আর জেঠু মুচকি-মুচকি হাসছেন। আমি তাঁদের ভেতরের ঘরে আসতে বললে তাঁরা আমার দিকে ছটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি ধরলাম। হঠাৎ দেখি আমি একটা দড়ি ধরে আছি। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে দড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে দিদি আর ঠাকুমার কাছে পালিয়ে গেলাম।
বিক্রম বিশ্বাস (বয়স-৮)

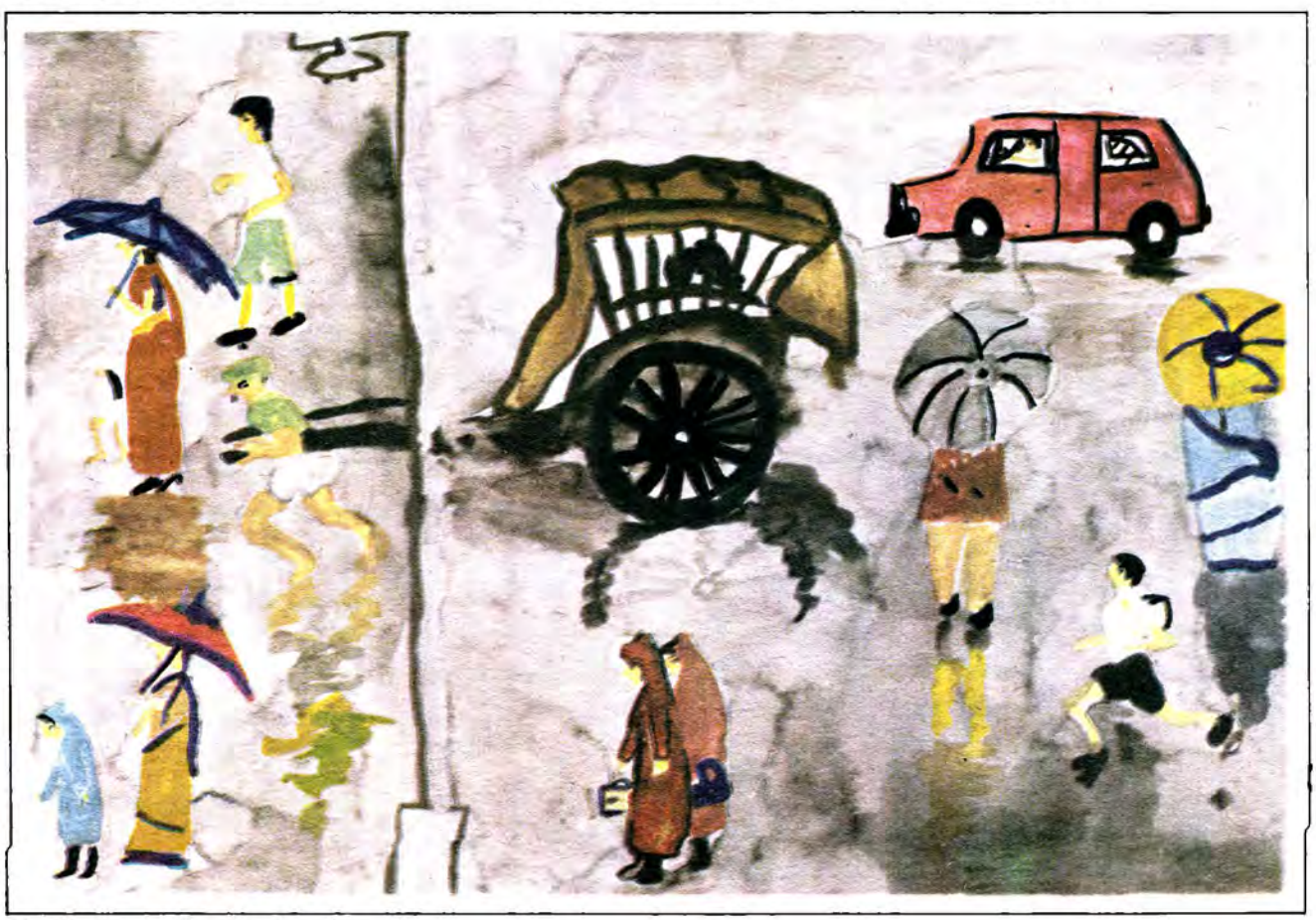

ছবি এঁকেছে **শাশ্বতী কন্দ্যোপাধ্যায়** (বয়স ৯)

ঝরাপাতার উৎসবে

পবিত্র সরকার

পৃথিবী-দেবী ডিমিটারের রূপসী মেয়ে পার্সিফোনি গিয়েছিল ফুলের বুনোট তোলা সবুজ মাঠে ফুল তুলতে। গোলাপ আর লিলি ছিঁড়ে নিলে সে গাছ থেকে, নত হয়ে মাটি ফুঁড়ে ওঠা ক্রোকাস তুললে, হায়াসিন্থের ডাঁটি নিলে ভেঙে, সরোবরের ধার থেকে তুললে নার্সিসাস। ফুলে দু-হাত বোঝাই, এবার হরিণের মতো লাফিয়ে ফিরবে মার কাছে, এমন সময় গুবগুর শব্দ করে মাঠ দু ভাগ হয়ে গেল—হাঁ-করা কালো গহ্বর থেকে সোনার রথে উঠে এল মৃত্যুলোকের দেবতা প্লুটো। পার্সিফোনিকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পাতালরাজ্যে নিজের রানী করলে সে।

মেয়ে-অন্ত প্রাণ ডিমিটারের শোকে পৃথিবী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল। সেবার বসন্তে গাছ জন্মাল না কোথাও, মাঠে ফলল না ফসল, ফুল ফুটল না অরণ্যে। মানুষের হাহাকার শুনে স্বর্গরাজ জিউস অস্থির হয়ে উঠলেন। জিউসের ক্রুদ্ধ হুকুমে প্লুটো পার্সিফোনিকে মার কাছে ফিরে যাবার অনুমতি দিলে, পথে খাবার জন্যে সঙ্গে দিয়ে দিলে ছাড়ানো ডালিমের দানা। হায়, পার্সিফোনি জানত না, সেই দানা খেলেই তাকে ফিরতে হবে মৃত্যুলোকে। যাই হোক, জিউস শেষ পর্যন্ত বিধান দিলেন, বছরের দু ভাগ সে থাকবে পৃথিবীতে, বাকি এক ভাগ পাতালে, স্বামীর কাছে।

পার্সিফোনিই তো বসন্ত। তাই সে যখন পাতালে যায় তখন সারা পৃথিবী জুড়ে শীতকাল নেমে আসে।

উত্তর মার্কিনদেশে কয়েক বছর আছি, তাই হাড়ে-হাড়ে জানি শীত কাকে বলে। কিন্তু শীত এখানে হঠাৎ আসে না, অনেক আগে থেকেই তার আসার তোড়জোড় শুরু হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি প্রথম বরফ পড়বে আমরা জানি, কিন্তু আগস্টের গোড়া থেকেই ঘাসের রং ফ্যাকাসে হতে শুরু করে, গাছের মুখ শুকনো দেখায়, আকাশ হয় গোমড়া। আর পাতা ঝরতে থাকে টুপটাপ টুপটাপ। আমাদের যখন হেমন্তকাল, প্রায় তখনই ওদেশে "অটাম"। তবে পাতা ঝরার ঋতু বলে তার আরেকটা নাম "ফল" (fall)।

হেমন্তে পাতা ঝরবে এ আর নতুন কথা কী! কিন্তু পাতা ঝরার আগে এদেশের কোথাও কোথাও,—যেমন মেন-এ, নিউ ইংল্যান্ডে, ম্যাসাচুসেটস বা ভার্জিনিয়ায়, কিংবা আমরা যেখানে আছি সেই মিনেসোটায়—একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটে। বনে গাছের পাতার সর্বাঙ্গ জুড়ে এক আশ্চর্য রঙের খেলা শুরু হয়। চোখের সামনে যত গাছ দেখছ, তারা ষড়যন্ত্র করে যদি দিন কয়েকের মধ্যে সকলে উজ্জ্বল রঙের পাতাবাহার গাছে বদলে যেত তাহলে যেমন হত, অনেকটা সেইরকম। নন্দনকাননের ফুলের শোভাকে হারিয়ে দিয়ে জেগে ওঠে আসন্নমৃত্যু পাতার

"নতুন ঘড়িটা আমার হাতে কেমন লাগছে ?

কি মনে হয়, ঘড়িটা আমি কেমন করে পেলাম ?
একি জন্মদিনের উপহার ? না, মোটেও না।
অঙ্কে একশ'র মধ্যে একশ পাওয়ার পুরস্কার ?
না, তাও না। ঘড়িটা আমি কিনেছি। হ্যাঁ,
ইউকোব্যাঙ্কে আমার জমানো টাকা থেকে।
ইউকোব্যাঙ্কে তুমিও অ্যাকাউন্ট
খুলতে পার। ব্যাপারটা খুবই সোজা।"

UCO-CAS/31 BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

সৌন্দর্য। হলুদ, কমলা, বেগুনি খয়েরি, লাল—এক-এক গাছের পাতার এক-এক রং—হেলিকপটার থেকে দেখলে মনে হয় মাইলের পর মাইল জুড়ে বনের মাথায় স্থির দাবানল জ্বলছে। উপরে বিশাল আকাশকে ঝলমলে আভায় সাজিয়ে দিচ্ছে বনের ছাদে কোন এক অলৌকিক শিল্পীর আঁকা ছবি।

যে শহরে থাকি, মিনিয়াপোলিসে, সেখানে গাছপালা প্রচুর কিন্তু বিস্তীর্ণ বনের এই শোভা কোথায়? এখানেও প্রচুর গাছ ঝলসে ওঠে, কিংবা মিসিসিপি নদীর ধারে ঝোপঝাড় রঙিন হয়ে যায়। কিন্তু মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যেতে ঐ নদী দিনে প্রায় চারবার পেরুতে হয়, লোকজন এলে নদীর ধারে বেড়াতে বা মাছ ধরতে যাই—ফলে তার রূপে চোখ ভরে না। বাড়িতে সকলের আক্ষেপ শুনি, "ফল কালার দেখতে চলো একদিন! এতদিন আছি।"

এখন ৪৫ নম্বর বাসে যাঁরা আমাকে ঝুলতে দেখেন, তাঁরা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ও সময় এই গরিবেরও একটা গাড়ি ছিল। সে খুব কুলীন কিছু নয়, কিন্তু দিব্যি চলে, আশি মাইলেও টুঁ শব্দটি করে না। এক শনিবার সকালে তার পেছনে ট্রাঙ্কে দুটি কম্বল, দুখানা সসপ্যান, জাপানি দোকান থেকে কেনা একটি কড়াই, রান্নার তেল, গুঁড়ো মশলার কয়েকটি প্যাকেট ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বাড়ির এক বছরের মহিলাটি তার মার কোলে বসল। গাড়ি ছুটল হাইওয়ে নর্থ ২৩৫ ধরে উত্তরে ডুলুথ শহরের দিকে। আমাদের লক্ষ্য আরো উত্তরে যাওয়ার—সেখানে নর্থ শোর ড্রাইভ ধরে মাইলের পর মাইল দাঁড়িয়ে আছে মেপল, বার্চ, বীচ, ওক ইত্যাদির অরণ্য. ওখানেই সবচেয়ে বেশি খোলে নাকি হেমন্তের রং। একেবারে সিলভার বে-তে গিয়ে থামব, দুশো মাইল ছুটে।

পথে কোথাও থেমে, কোথাও পথপাশের সরাইখানায় গরম কালো কফি খেয়ে, কোথাও নিছক প্রকৃতির শোভা দেখে সাড়ে বারোটা নাগাদ ডুলুথে পৌঁছুনো গেল। এটি একটি বন্দর, মিনেসোটা রাজ্যের খনিজ লোহা, আর গম এখান থেকে জাহাজে রপ্তানি হয়। এখানেই দুপুরের ভোজন। একটি কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেনের দোকানে ঢুকে ভাজা মুরগি, কোল স্ল স্যালাড, পাউরুটি আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের লাঞ্চ। কেনটাকি মুরগি-ভাজার বিজ্ঞাপনে বলে, এ নাকি 'ফিংগার-লিকিং গুড'! অর্থাৎ খাওয়ার পর আঙুল চাটতে ইচ্ছে হয়। এমন সত্যি বিজ্ঞাপন আর নেই। যাতে মুরগি ডুবিয়ে ভাজে সেই ব্যাটার বা মাখাটায় কী একটা কৌশল আছে—আর-কোনো মুরগিভাজা এর ধারে-কাছেই পৌঁছোয় না। শুনেছি, কেনটাকি থেকে রোজ প্লেনে করে দেশের হাজার হাজার দোকানে সেই ব্যাটার পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে ভাজা হয় মুরগি। সে ফর্মুলা অনেকটা মন্ত্রগুপ্তির মতো। থাক আর বলব না, তোমরা কষ্ট পাবে।

পথে আমাদের তিনজনের তিনটে কাজ ভাগাভাগি হয়ে গেছে দেখা গেল। আমার গাড়ি চালানো; বাড়ির গৃহিণীর সকলের জিভের তদারকি করা, না চাইতেই হাতের কাছে ধরা হয়েছে চিপস বা কাজুবাদামের প্যাকেট; আর এক বছরের ভদ্রমহিলাটির কাজ দাঁড়াল আমোদপ্রমোদ সরবরাহ। সে দু পাশের প্রকৃতিশোভা সম্বন্ধে নিয়মিত রানিং কমেন্টারি দিয়ে গেছে দুর্বোধ ভাষায়, অকারণে হেসেছে, এবং গাড়ির স্পীড পঞ্চাশ মাইলের নীচে নামলেই কেঁদে উঠে বিরক্তি জানিয়েছে। সে ছাড়া বাকি বয়স্ক দুটি ব্যক্তি অবশ্য এই সব অবস্থায় বাঙালির যা কর্তব্য তা করেছে, অর্থাৎ চেঁচিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছে সর্বক্ষণ।

এইবার শুরু হল ঝরাপাতার শোভা। ডান দিকে লেক সুপিরিয়র মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, বড়লোকদের বাগান-ওয়ালা বিশাল সুন্দর বাড়ি তার ধারে, ঘাটে মোটরবোট বাঁধা। বাঁ দিকে বন আস্তে আস্তে ঘন হচ্ছে। টু হারবারস পেরিয়ে যেতেই নর্থ শোর ড্রাইভ নামে রাস্তাটি রোমহর্ষক চেহারা নিতে শুরু করল। কী রং, কী রং। এমন নয় যে, সবুজের ছিটে কোথাও নেই। ঘাস ফ্যাকাসে সবুজ, আর পাইনগাছ বা তারই আত্মীয়স্বজন লার্চ, ফার বা সিডার গাছ—এখানে ওখানে চিরহরিৎ স্পর্ধা নিয়ে দাঁড়ানো। তবে আমাদের কপাল খারাপ। দিনটা মেঘলা হয়ে গেল হঠাৎ, আর যথাসময়ের আগেই যেন সন্ধে নেমে এল। মনটা খারাপ হল একটু। হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলুম, এবার সিলভার বে-তে গিয়ে সোজা একটা মোটেলে ঢুকে পড়ব ভাবছি, এমন সময়—"দুম" করে শব্দ, কেঁপে উঠে গাড়ি যেন ছিটকে গেল খানিকটা। কী হল বোঝবার আগেই পাশের ব্যক্তিটি চেঁচিয়ে উঠলেন, "দ্যাখো, দ্যাখো!" কিছু দেখার আগেই আরেকবার ধাক্কা। দেখি একটি বিশালকায় "মুজ" —বলগাহরিণের মাসতুতো ভাই বলতে পারো—মাথায় ফণিমনসা গাছের মতো শিঙের ডালপালা সুদ্ধ গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেল, তারপর আমি ব্রেক কষতেই খটখট করে রাস্তা পার হয়ে ওপাশের বনে ঢুকে গেল। নিশ্চয়ই আমাদের সম্বন্ধে খুব একটা ভাল ধারণা নিয়ে গেল না সে।

সিলবার বে-র মোটেলে যে ঘর পেলুম তার পিছনেই লেক সুপিরিয়র ছলাত ছলাত করে এসে আলাপ করতে চায়। এখানে রান্নার সব ব্যবস্থা আছে, কাজেই নিয়ে-আসা কড়াই-টড়াই বেশ কাজে লেগে গেল। বাঙালি অন্নব্যঞ্জন খেয়ে ঘুমটি হল বেশ। পরদিন লেকের জল থেকেই একটি টকটকে সূর্যকে আড়মোড়া ভেঙে জাগতে দেখলুম—চতুর্দিক রঙে ভরিয়ে দিয়ে। মনটা প্রসন্ন হল। সকালবেলাটায় নিশ্চয়ই রোদ থাকবে—রঙের ঐশ্বর্য সব ফুটে উঠবে উজ্জ্বল আকাশের নীচে।

বেশি দেরি না করে সংসার গাড়িতে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আবার। ফেরার পথ না ধরে উজিয়ে গেলুম আরো উত্তরে—সেখান থেকে একটা "ট্রেইল" অর্থাৎ বনপথ ধরলুম। গাড়ি চলতে লাগল ধীরে ধীরে। দু পাশে গাছ, মাথার উপরে গাছের ছাউনি, এবার চারপাশের বিচিত্র রঙের মধ্যে যেন ডুবে গেলুম আমরা, রঙের সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগলুম যেন। সব গাছ যেন আগুনের শিখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জেবলে ধরেছে হলুদ সোনালি লাল মশাল। শুগার মেপল গাঢ় হলুদ হল তো রেড মেপল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমলা রং ধরল—হেমন্তের বনের অর্ধেক শোভা মেপল পাতার এই রঙের খেলার। একই ঋতুর মধ্যে তারা রঙ বদলে নেয়, ম্লান জরদ থেকে গনগনে আগুনের রঙে ছুটে যায়, পাতার প্রান্তে আনে মেরুনের আভা—আকাশ মাতিয়ে দেয় তারা। ঐ তো বার্চের দঙ্গল দাঁড়িয়ে তাদের ঝরা পাতার শোক নিয়ে, সরল চুনকাম-করা কাণ্ডে কালো রঙের রিং বসানো তাদের, তাদের পাতার বাহারই কি কম? অ্যাশ, আস্পেন, বীচ আর ডগউড গাছের দল দাঁড়িয়ে আছে তাদের হলুদ পাতার উপঢৌকন নিয়ে, মাঝখানে একটা দুটো ওক আবার তারই মধ্যে খয়েরি হয়ে আছে। হঠাৎ তাদের বড় বিষন্ন দেখাচ্ছে। একটা ছুটকো টলটলে জলের দিঘির ধারে দেখি স্যুমাকের ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে গাঢ় মেরুন হয়ে। এত রং আছে পৃথিবীতে, দুচোখে একসঙ্গে এত রং কি দেখা যায়? পাতায়-পাতায় এত ঝলমলে সাজগোজ, এত সৌন্দর্য আকাশে অরণ্যে চেনা-অচেনা গুল্মলতায়! পার্সি-ফোনি, এই কি তোমার বিদায়ের উৎসব? পৃথিবীর সব রং নিয়ে তুমি চলে যাবে এবার?

পথের ধার থেকে একটি গোল্ডেন রড ফুল সোনালি শিস দুলিয়ে যেন বলে উঠল, "ও মা! বসন্তের ফুলে এইসব রঙই তো আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে সে!"

ভূমিকম্প!
গুহার ছাত ভেঙে পড়ছে! মারা যাব!
টারজান
এডগার রাইস বারোজ

ক্ষতি কী?

মশালটা যেন না-নেভে!

থেমেছে!
ভূমিকম্প থেমেছে!
সবাই বাইরে চলে এসো!

পাথর পড়ে পথ আটকে গেছে!
হটাও পাথর!

পাথরটাকে হটিয়ে দেওয়া শক্ত হবে না!
বাইরে রোদ্দুর!

আঃ!
বাঁচলুম!
উঃ!
বেঁচে গেছি!
কিন্তু টারজান, তোমার ওই আকাশী যন্তরটা পালাচ্ছে কেন?
ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারে না, সেইজন্যে।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

শব্দ সন্ধান

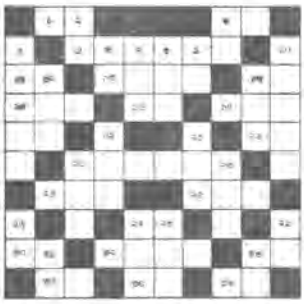

সংকেত : পাশাপাশি : (১) হিংসুক, তবে ওষুধে পেষাই করতে লাগে। (৫) আকাশের পাথর, যখন পৃথিবীতে নেমে আসে অনেকে বলে তারা। (৫) প্রাচীন ভারতের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। (১১) পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের প্রধান খাদ্য। (১৩) আমাদের প্রতিবেশী এক দেশের প্রাচীন রাজধানী। (১৪) শিকারী পাখি। (১৫) একরকমের গয়না। (১৬) প্রাচীন ঋষি, যাঁর আর-এক পরিচয় মানুষ। (১৭) দুধের সারবস্তু। (১৮) নলখাগড়া, আবার ক্ষেপণাস্ত্রও। (২১) কপালের পাশেই থাকে। (২২) বিশ্ববিখ্যাত কবি এবং নাট্যকার। (২৪) প্রবলঝড়। (২৫) হেমন্তের ধান-কাটার পর যে-উৎসব হয়। (২৭) গোয়েন্দা-কাহিনীর নায়ক। (৩০) প্রাচীন রাজবংশ। (৩২) বহুরূপী। (৩৩) প্রিয়জন। (৩৪) সে-বনে সিংহ থাকে। (৩৫) দৌড়বাজ প্রাণী। (৩৬) বসন্তের পুষ্প।

উপর-নীচ : (২) রামায়ণের চরিত্র। (৩) অনেকের মতে পৃথিবীর প্রথম মহানগরী। (৪) ফুলের নাম। (৬) ভারতের এক বিশেষ অঞ্চলের রাজকীয় খেতাব। (৭) যে-কাজের জন্য অস্ত্রের আবিষ্কার। (৮) পাহাড় আর উপজাতি দুইই হয়। (৯) গাছের রস জমাট বাঁধলে হয়ে যায় রান্নার উপকরণ। (১০) ফুল, গুচ্ছ ছাড়া মানায় না। (১২) রবীন্দ্রনাথের হৃদয় কোন্ পাখির মতো নেচেছিল? (১৪) সিংহের নামে এক মুঘল সম্রাট। (১৯) হাতের অলংকার। (২০) না থাকলে সবই অন্ধকার। (২২) শরতের ফুল। (২৩) বাদ্যযন্ত্র। (২৬) অশ্বারোহী পর্বের প্রাণী। (২৭) দুই বা তিন চাকার গাড়ি। (২৮) বসন্তের ফুল। (২৯) নদীর নামে সমুদ্র। (৩১) নৌকো চালায়। (৩৩) পাখি, ফুল আর যন্ত্র—তিনটেই হয়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

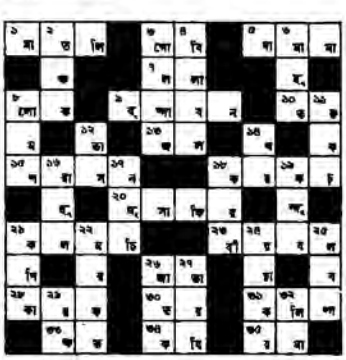

ধাঁধা

"তুই বর্গ জানিস?" ধাঁধা নেব বলে ঘরে ঢুকতেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল ছোট্কা।

হঠাৎ বর্গের কথা উঠল কেন, আমি বুঝতে পারি না। বর্গকে তো ইংরেজিতে বলে স্কোয়ার। সে আর কে না জানে! তাই বললাম, "জানি।"

"বল তো, ৪-এর বর্গ কত?" ছোট্কা আমাকে যাচাই করে নিতে চাইল যেন।

"১৬।" আমি একটুও দেরি না করে উত্তর দিই।

"অলরাইট। চলবে।" ছোট্কা যেন এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হল। তারপর বলল, "একটা দারুণ ধাঁধা পেয়েছি সতুবাবু। কিন্তু সেটা করতে গেলে বর্গ কাকে বলে জানা দরকার। আরেকটা কথার মানেও অবশ্য জানলে ভাল হয়। বল তো, বৃদ্ধপ্রপিতামহ মানে কী?"

"প্রপিতামহের বাবা।" এটাও আমার জানাই ছিল। তাই এবারেও উত্তর দিতে দেরি হল না।

"থ্যাঙ্ক য়ু।" ছোট্কার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল। তারপর বলল, "গতবার জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ধাঁধা পেয়ে গিয়েছিলাম। এবার বিনা নেমন্তন্নে জন্মদিন নিয়েই একটা সুন্দর ধাঁধা পেয়ে গেলাম।"

কথা শেষ করে ছোট্কা একটা খাম এগিয়ে দিল। খামের ওপর ছোট্কার নাম লেখা। ভেতরে একটা চিঠি। চিঠিটা ছোটকাই খুলে পড়ে শোনাল।

চিঠিতে এক ভদ্রলোক খুব বিচিত্র একটা খবর জানিয়েছেন। চিঠিটাকেই একটু অদল-বদল করে তৈরি করা হল এবারের প্রথম ধাঁধা। ধাঁধাটা ভদ্রলোকের জবানিতেই দেওয়া যাক।

প্রথম ধাঁধা ॥ আমাদের বাড়িতে জন্মদিন নিয়ে একটা বিচিত্র যোগাযোগ ঘটে গেছে। দু-পুরুষ ধরে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে।

আমাদের পরিবারে আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ, প্রপিতামহ, পিতামহ, আমার পিতা এবং আমার জন্ম মাসের ১০ তারিখে। আমার ছেলেও, কী আশ্চর্য, জন্মেছে দশ তারিখে।

আবার আরও বিস্ময়কর ঘটনা হল, আমাদের জন্ম ঠিক পর-পর মাসে। যেমন বৃদ্ধপ্রপিতামহ জানুয়ারি মাসে, প্রপিতামহ ফেব্রুয়ারিতে, পিতামহ মার্চে, পিতা এপ্রিলে—এইভাবে।

আরও অদ্ভুত একটা যোগাযোগের কথা এবার বলি।

আমার ছেলের যে-বছরে জন্ম, সেই ইংরেজি সালটা আমার তৎকালীন বয়সের বর্গ। আমার পিতা যে-সালে জন্মেছেন, সেই ইংরেজি সাল আমার পিতামহের তৎকালীন বয়সের বর্গ। আমার প্রপিতামহ যে ইংরেজি সালে জন্মেছেন সেটা আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহের তখনকার বয়সের বর্গ।

আমার ছেলের জন্ম এই শতাব্দীতে। এবার বলুন তো, আমরা কে কবে জন্মেছি?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটি ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা তিন কিলোমিটার হেঁটে গেল। তারপর ডান দিকে ঘুরে সোজা দুই কি মি হেঁটে গেল, ফের ডান দিকে ঘুরল এবং সোজা হাঁটল ছয় কি মি।

সে যদি আর মাত্র দু-বার ডান দিকে ঘুরে সোজা বাড়ি ফিরতে চায়, তাহলে এরপর মোট কতটা পথ হাঁটতে হবে তাকে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নদী আছে জল নেই, দেশ আছে মাটি নেই, শহর আছে লোকজন নেই, পাহাড় আছে পাথর নেই—এমন জায়গা দেখেছ কোথাও?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

৭	১৬	৯
৫	২১	১৬
৯	?	৪

গতবারের উত্তর ॥ (১) মাত্রই চার-রকমে ভোট ভাগ করা সম্ভবপর। ৩২০০, ৩১১০, ২২১০ ও ২১১১—এই চারভাবে। স্পষ্টতই, খাস্তগীরের ভোট ২১১১ ভাবে ভাগ হয়েছে। গাঙ্গুলি তাঁর মেয়েকে ভোট দেননি। ঘোষ নিজের মেয়েকে ৩ ভোট দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত কর খাস্তগীর ও গাঙ্গুলির মেয়েকে সমান ভোট দিয়েছেন, কিন্তু সেই ভোট ১ করে হতে পারে না, কেননা গাঙ্গুলির মেয়ে অর্থাৎ গ-কে সেক্ষেত্রে ঘোষের কাছ থেকে ৩ ভো পেতে হয়, নইলে ৫ ভোট হয় না তার। কিন্তু নিজের মেয়েকে ৩ ভোট দিয়ে ঘোষের হাতে অবশিষ্ট ছিল মাত্র ২ ভোট। তাহলে শ্রীযুক্ত কর খ ও গ-কে ২ ভোট করে দিয়েছেন। তাঁর ভোট ভাগ হয়েছে ১২২০ হিসেবে। ঘোষ তাহলে গ-কে আরো ২ ভোট দিয়েছেন, ক ও খ-কে কোনো ভোট দেননি। গাঙ্গুলির ভোট ভাগ হয়েছে ৩১০১ হিসেবে। নীচে একটা তালিকা দেখানো হল—

	ক	খ	গ	ঘ
শ্রীযুক্ত কর	১	২	২	০
শ্রীযুক্ত খাস্তগীর	১	২	১	১
শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি	৩	১	০	১
শ্রীযুক্ত ঘোষ	০	০	২	৩

(২)৯৯,১০০,১০১ (৩) জলঢাকা, ইছামতী, রায়মঙ্গল, মাতলা ও সরস্বতী—এই নদীর নামগুলো ওলটপালট করে লেখা ছিল। (৪) ৩৫।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল টাইপরাইটারের অক্ষরের ফোটো

ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কাকে দুবার ডাকলে তার ভাই এসে হাজির হয়?
উঃ মা-কে।

প্রঃ কোথায় 'আপ' বললে উপর থেকে নীচে আর 'ডাউন' বললে নীচ থেকে উপরে বোঝায়?
উঃ রেলের টাইম-টেবলের পাতায়।

প্রঃ অতীত কালকে কী করে ভবিষ্যৎ কালে রূপান্তরিত করা যায়?
উঃ ডাল রাবার দিয়ে 'অতীত' কথাটা মুছে তার উপর 'ভবিষ্যৎ' লিখে।

প্রঃ সারস পাখি এক-পা তুলে ঘুমায় কেন
উঃ দু-পা তুললে পড়ে যাবে বলে।

প্রঃ কোন্ বাংলা খাবারের অর্ধেকেই তার ইংরেজি?
উঃ তরকারি। ইংরেজিতে কারি।

প্রঃ উঁচু জায়গার নাম কেন পাহাড় হয়েছে?
উঃ বোধহয় উঁচু থেকে পড়লে পায়ের হাড় ভাঙে বলে।

প্রঃ শাজাহানের কোন ছেলের মাথায় এখন সিং গজিয়েছে?
উঃ দারা-র।

সুসেন

মজার খেলা

একটা রবার ব্যান্ড নিয়ে ডান হাতের প্রথম দুই আঙুলে—পোশাকী বাংলায় যাকে বলা হয় তর্জনী ও মধ্যমা—গলিয়ে দাও। এরপর হাতটা মুঠো করে ফেলো। রবার ব্যান্ড পরা হাতের পিছন দিকটা তখন দেখতে হবে ১ নম্বর ছবির মতো। এবার আস্তে-আস্তে হাতের মুঠো খুলে দাও। আঙুলগুলো যখন টানটান হয়ে খুলে যাবে, তক্ষুনি একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে দেখবে দর্শকরা। তারা দেখবে, প্রথম দু-আঙুল থেকে রবার ব্যান্ড ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। শেষ দুই আঙুলে—সাধু বাংলায় যাকে বলে অনামিকা ও কনিষ্ঠা—সরে গেছে। একবার নয়, দু-বার তিনবার—যতবার খুশি ততবার—দেখাতে পারো খেলাটা। কোনো ভয় নেই।

খুবই সহজ এই খেলাটা দেখানো। ডান হাতটা তুলে ধরো সটান। হাতের পিছন দিকটা দর্শকদের দিকে থাকবে। আঙুলগুলো খোলা। এবার বাঁ হাত দিয়ে তর্জনী ও মধ্যমায় রবার ব্যান্ড গলিয়ে দাও। হাতের পিছন দিক দর্শকদের দেখিয়ে রেখেছ—এই অবস্থায় আঙুলগুলো মুঠো করো। আর বাঁ হাত দিয়েই হাতের সামনের দিকে রবার ব্যান্ডটা টেনে চারটে আঙুলের ওপরেই রবার ব্যান্ডটা পরিয়ে দাও। ২ নং ছবি দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ছবিটা তোমার দিক থেকে আঁকা। দর্শকরা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে যে, রবার ব্যান্ড চার-

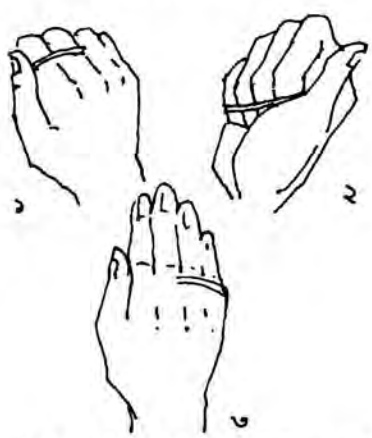

আঙুলের ওপরে রেখেছ। তারা ভাববে হাতটা স্বাভাবিক ভাবেই মুঠো করা হয়েছে। এবার যদি আঙুলগুলো টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে মুঠোটা খুলে দাও তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই রবার ব্যান্ডটা প্রথম দু-আঙুল থেকে লাফিয়ে পরের দুই আঙুলে চলে যাবে। তিন নম্বর ছবিতে সেই অবস্থাটা দেখানো হল।

মজারু

আটখানা

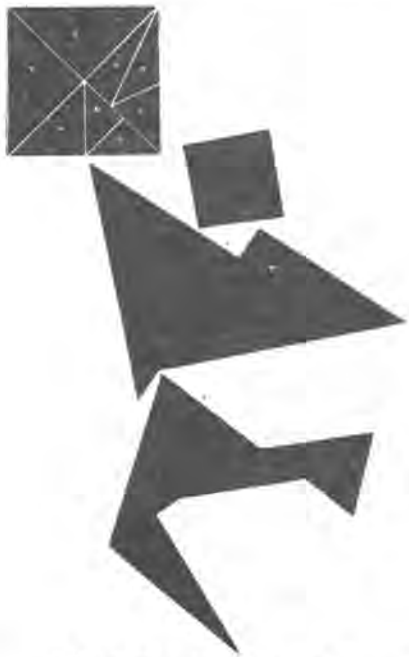

প্রতিপক্ষের আঘাতের হাত থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, গতবারে কারাটের একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তা' দেখিয়েছি। এবারের আটখানায় দ্যাখো, প্রতিপক্ষের আক্রমণে বেসামাল হয়ে পড়েছে, কিন্তু পায়ের উপর সমস্ত শরীরের ভর রেখে শুধু শরীরের অর্ধেকটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়েছে। একদম ধরাশায়ী হয়ে গেলে তো রক্ষে নেই। এই ধরনের আক্রমণের পরেই চোখের নিমেষে প্রতি-আক্রমণ করতে হয়। প্রতি-আক্রমণের ছবি দেখতে পাবে আগামী সংখ্যায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

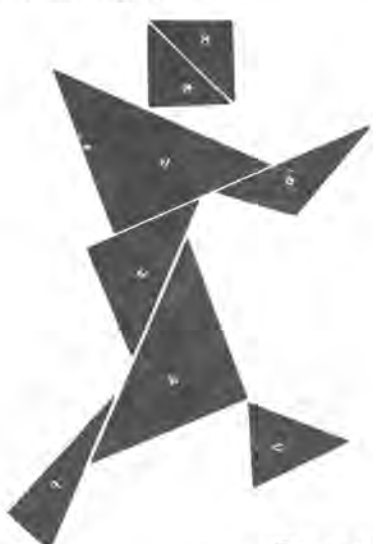

অসিত পাল

বুঝতে পেরেছি!...এগুলি হচ্ছে...এগুলি হচ্ছে...
পুরনো দলিল! হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরনো দলিল!
নাঃ, লোকটা আমাকে পাগল করে ছাড়বে!
আরে, তুমি আবার কী করছ এখানে?

আমি? আমার সঙ্গী জলে নামছে তো, তাই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি...না, না, চিন্তা কোরো না, তোমাদের দেখে-দেখে ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি...
আর পাম্পটা? ওটা বুঝি নিজের থেকেই চলবে?
পাম্প না-চালালে লোকটা দম বন্ধ হয়ে মরবে যে!

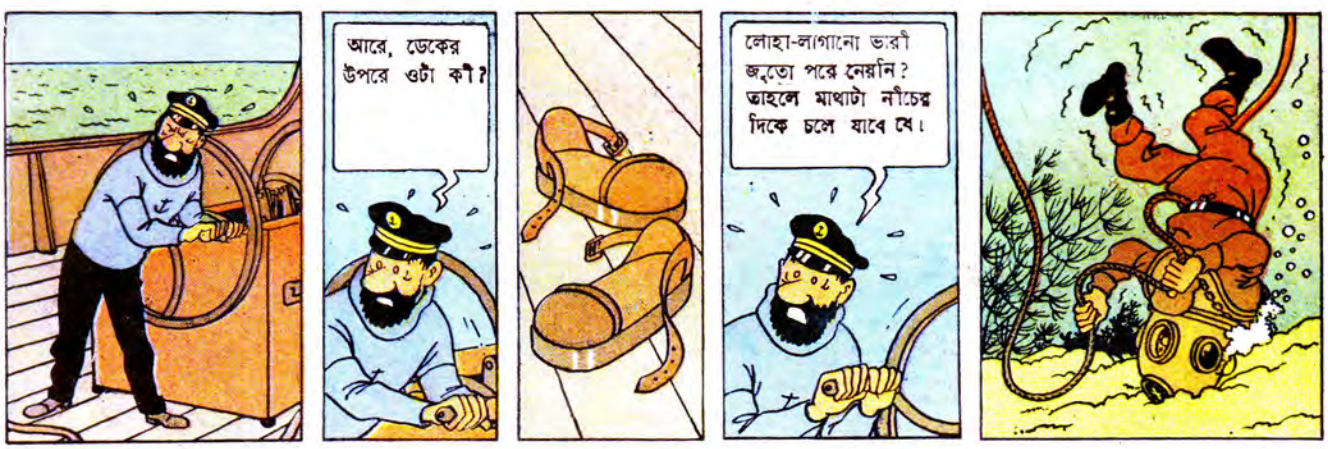
আরে, ডেকের উপরে ওটা কী?
লোহা-লাগানো ভারী জুতো পরে নেয়নি? তাহলে মাথাটা নীচের দিকে চলে যাবে যে।

পনর দিন বাদে...
আমরা সেই পাম্প করেই চলেছি! করেই চলেছি!
আরে, তোমরা পাম্প করছ কেন? টিনটিন তো জল থেকে উঠে এসেছে!
খবর কী? কিছু পেলে?
কিছু না! অনেক তল্লাসি করেও কিছু পেলুম না!
ধুত! কিছু পাওয়া যাবে না!
এত অধৈর্য হচ্ছ কেন!

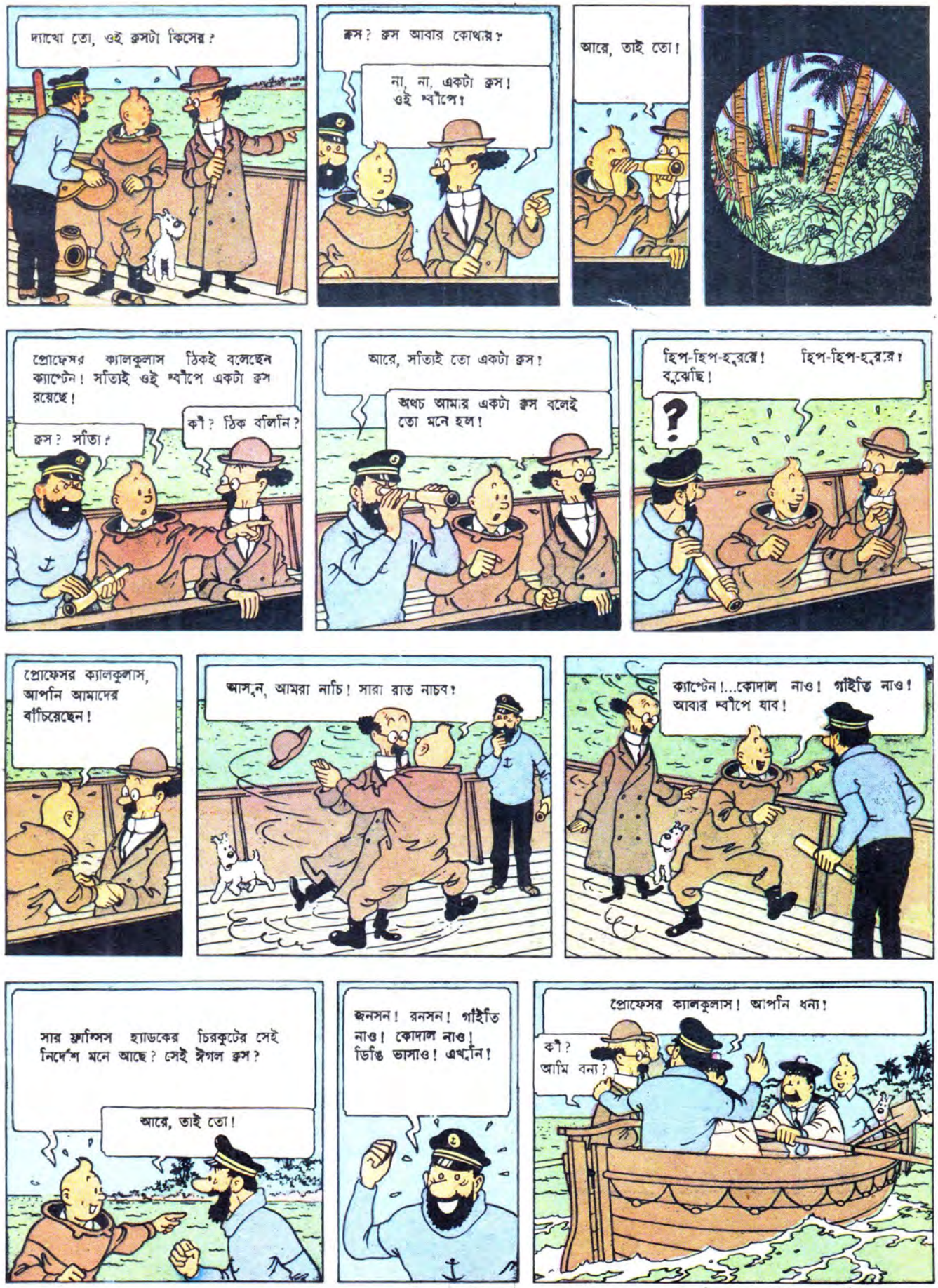

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

৭৭—৬৯—৮—০।
৬৯—৫১—১৮—০।
৮০—৩৯—৪১—০।

হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে এগুলো কোনও বড় বোলারের বোলিংয়ের পরিসংখ্যান। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হবে, এমন বোলিং করে কোনও উইকেট নেই। তা কী করে হয়?

ফোটো : পার্থসারথি নিয়োগী

আসলে ঐ সংখ্যাগুলো পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সাফল্যের সোনার ফসল। মোট পরীক্ষার্থী, প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ—এই ক্রম অনুযায়ী তিন বছরের পরীক্ষার ফল, ১৯৭৮, ১৯৭৭ ও ১৯৭৬ বোঝানো হয়েছে। তাই শেষের শূন্যগুলি যে কোনও স্কুলের পক্ষে স্বপ্ন। আর এবছরের ফল? অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। শুধু উনসত্তরজন প্রথম বিভাগই নয়, মোট ২২০টি লেটার মার্কস ও ২৪টি 'স্টার' মার্কস আছে। প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে বিদ্যাপীঠেরই চারজন—সঞ্জয় পাত্র (৪র্থ), বিবেককৃষ্ণ দে (৫ম), অলোকনাথ দে (৮ম) আর অরুপানন্দ পাল (২০তম)।

আরও আছে। পাসের হার বিনা থার্ড ডিভিশনে শতকরা একশো—এটা পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির প্রথম দু বছরের ফল তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি। হয়ত এই কারণেই যে, ঐ সময় শিক্ষক-ছাত্র সকলেরই দৃষ্টি ছিল মুখ্যত বিদ্যালয় গড়ার দিকেই। ১৯৬৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এখনও ফেল করেনি। এ পর্যন্ত মোট ফার্স্ট ডিভিশনের সংখ্যা ৯৭২। আর এই ৯৭২ জনের মধ্যে ৪৭ জন বিভিন্ন স্থান পেয়েছে।

আমাকে এইসব পরিসংখ্যান দেওয়ার সময় কিন্তু প্রধান শিক্ষক স্বামী অমরানন্দ কথাবার্তায় বা হাবভাবে কোনওরকম অহঙ্কার প্রকাশ করেননি। হয়ত সন্ন্যাসী বলেই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব।

স্বামী অমরানন্দের কাছে ওখানকার পঠন-পাঠনের বৈশিষ্ট্য জানতে চাইলাম। উনি বললেন, ফসল ভাল করতে গেলে যেমন ভাল জমি আর ভাল বীজ দরকার, তেমনি পরীক্ষার ফল ভাল করতে হলে চাই ভাল পরিবেশ ও ভাল ছাত্র। বিদ্যাপীঠে নিয়মিত দৃষ্টি দেওয়া হয় যাতে হোম-ওয়ার্ক ঠিকমতো হয়। বস্তুত এটা দেখা সহকারী প্রধান-শিক্ষকের একটা বড় দায়িত্ব। তিনিও একজন সাধু-কর্মী। প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে দুজন হেড-টীচার আছেন। তাঁদের প্রধান কাজ হল, প্রগতি-পরিকল্পনা অনুযায়ী পড়াশোনা ঠিকঠাক চলছে কি না, তা দেখা। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক বিষয়, সিলেবাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনটি পিরিয়ডিকাল ও অ্যানুয়াল পরীক্ষা ছাড়াও ক্লাস টেস্টের ব্যবস্থা আছে। মোট নম্বরের ৬০ ভাগ অ্যানুয়ালে, ৩০ ভাগ পিরিয়ডিকাল ও ১০ ভাগ ক্লাস টেস্টের উপর। যারা সুবিধা করতে পারছে না, অথচ ঠিক পথে চালিত হলে করবে, সেই আন্ডার অ্যাচিভারদের জন্যে সব সময়েই বিশেষ ব্যবস্থা—টিউটোরিয়াল ক্লাস ছাড়াও সেটা স্কুলের সময়ের বাইরে—সকালে অথবা সন্ধ্যায়। মাঝারিদের জন্যে টেস্ট পরীক্ষার পর বিশেষ কোচিং। আর ক্লাস টেনের প্রথম পাঁচজনের জন্যেও বিশেষ কোচিং।

বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্বামী অমরানন্দের সঙ্গে আলোচনা হল। ইচ্ছা ছিল বিদ্যালয়-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ অর্থাৎ স্বনামধন্য বরুণ মহারাজের সঙ্গেও আলোচনা করার, কিন্তু সময়াভাবের জন্য পারলাম না।

স্বামী অমরানন্দের মতে নতুন মাধ্যমিক পাঠক্রমে বিজ্ঞানে এবং আনুষঙ্গিক দিকগুলিতে চাপ দেওয়ার জন্যে ভাষা শিক্ষায় পর্যাপ্ত নজর দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ইংরেজি (বা বাংলা) ভালভাবে শিখতে গেলে নীচের ও মাঝারি স্তরে ভাষার উপর বেশি করে জোর দেওয়া উচিত। আসলে ইংরেজির মোট নম্বর কমলেও ভার কিছুই কমেনি। অবশ্য আজকাল প্রশ্ন এমনভাবে তৈরি হয় যে, লেটার পাওয়াটাও খুব একটা সাম্বাতিক ব্যাপার নয়। ইংরেজিতে ভাল ফল করতে গেলে অল্পের মধ্যে উত্তর লেখার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ইডিয়মগুলিকেও। বিশেষত গ্রুপ ভার্বের ব্যবহার শেখার উপর জোর দিলেন অমরানন্দজী। শব্দভাণ্ডার বাড়ানোর প্রয়োজনের কথাও তিনি বললেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভাল বই, দৈনিক পত্রিকা, সাম্প্রতিক পত্রপত্রিকা বিশেষত, বিজ্ঞান বিষয়ক দু একটি পত্রিকা পড়ার কথা বললেন।

সংস্কৃত সম্পর্কে ওঁর বক্তব্য : দেবনাগরী হরফের সঙ্গে পরিচয় চাই। সংস্কৃত উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে লিখে লিখে পড়া দরকার। বিশেষ করে হস চিহ্ন দুই ন ও বিসর্গ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া উচিত। সন্ধি, সমাস ও বাচ্য সম্পর্কে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার।

দুই বিজ্ঞান সম্পর্কে : ফিজিক্যাল সায়েন্সে মূল বিষয়গুলির সূত্র, সংজ্ঞা, এগুলি ভাল করে বুঝতে হবে। শুধু মুখস্থ করলে চলবে না। ঐ ভাল করে বোঝাটা লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া চাই। একক-সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। মনে রাখতে হবে, ফিজিক্যাল সায়েন্সে শুধু বই ধরে পড়ে গেলে মুশকিল আছে। ফিজিক্যাল সায়েন্সের চেয়েও

বেশি সচেতন থাকতে হবে লাইফ সায়েন্সে। বিষয়টি একেবারেই নতুন। এমনই বিষয় যে, কোনও একটা বইতে সব কিছু পাওয়া যায় না। বহু রেফারেন্স বই সংগ্রহ করতে হবে। আর, বলা বাহুল্য, বিরাট দরকার হল স্কেচ।

অঙ্কে সবচেয়ে বড় কথা প্র্যাকটিস। অঙ্ক করে আনন্দ পাওয়া চাই। ওতে নেশা থাকা চাই। বিশেষত, জ্যামিতির ক্ষেত্রে ভাষার দিকে নজর রাখতে হবে। (সমান আর সর্বসম যেন গন্ডগোল হয়ে না যায়।) অঙ্কন যেন স্বয়ংব্যাখ্যাকারী হয়। অঙ্কেও একক-সচেতনতা দরকার। বিভিন্ন ফর্মুলা চার্টের আকারে সামনে রাখতে হবে, যাতে রোজ একবার করে চোখ বুলিয়ে নিতে পারা যায়।

ভূগোলে শুধু বইয়ের মধ্যে সব জিনিস পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রচুর খবর রাখতে হবে। তেল সমস্যা নিয়ে কেন হঠাৎ এত মাথা ঘামাচ্ছে সবাই, ফরাক্কার গুরুত্ব কী—এসব জানতে হলে ভাল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বই থেকে ও সংবাদপত্র থেকে বিভিন্ন বিষয় ও প্রকল্পগুলো সম্পর্কে খবর রাখতে হবে। স্বামী অমরানন্দ ওয়ার্কবুক ও শিক্ষামূলক প্রোজেকটের কথাও বলতে ভুললেন না।

ইতিহাস সম্পর্কে উনি ১৪ জুলাইয়ের আকাশবাণীর সংবাদ উদ্ধৃত করে বললেন যে, গত পরীক্ষায় সওয়া দু' লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুজন লেটার পেয়েছে। নম্বর কম ওঠার দুটি কারণ—ইতিহাসে অবজেকটিভ প্রশ্ন আনুপাতিকভাবে কম এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষকদের প্রত্যাশা অত্যন্ত বেশি। তাই দরকার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উত্তরে বেশি তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা। এর জন্যে চাই বেশি করে উপরের ক্লাসের বই পড়া।

ওয়ার্ক এডুকেশনে গতবার বিদ্যাপীঠের সাতাশজন ছাত্র ৮০ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে। তাই মাসিক আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম এর রহস্য। উনি বললেন, মনে রাখতে হবে ওয়ার্ক এডুকেশনে মূল্যায়ন কার্যত মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমেই হয়ে যাচ্ছে। তাই যতরকম প্রশ্ন হতে পারে তৈরি করে রাখা দরকার। তৈরি জিনিসের কন্টেন্ট সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। আনুষঙ্গিক জ্ঞান থাকা চাই। ওয়ার্কবুকটিও নিখুঁত হতে হবে। অবশ্য ওয়ার্ক এডুকেশন বিষয়টির সঙ্গে অনেক অব্যবস্থা জড়িত।

মাসিক আনন্দমেলা সম্পর্কে স্বামী অমরানন্দ বললেন, এতে সিলেবাস ও পঠন-পাঠন সম্পর্কেও কিছু আলোচনা থাকলে ভাল হয়। পূজা সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতামত সম্পর্কে উনি বললেন, এতে দারুণ উপকার হবে। শুধু ছাত্রদের নয়। শিক্ষকদেরও।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

দেবাশিসকে মনে আছে? সেন্ট-লরেন্সের ও মাধ্যমিক (১৯৭৭) পরীক্ষার ফার্স্ট বয় সেই দেবাশিস বসু? পুরুলিয়ার এবারের টেন-এর ফার্স্ট বয় হীরকজ্যোতি সেনকে দেখে দেবাশিসের কথা মনে পড়ে গেল। সেইরকমই রোগা আর চোখের পাওয়ারও মাইনাস সিক্স।

হীরকের ইচ্ছে ডাক্তারি লাইনে যাওয়া। তাই লাইফ সায়েন্সই ওর প্রিয় বিষয়। এবং সবচেয়ে বেশি জোর ও লাইফ সায়েন্সেই দেয়। এতে পড়ে লাইফ : ইটস ফর্ম অ্যান্ড ফাংশন (ম্যাকমিলান) ডি জি ম্যাকফিনের ইন্ট্রোডাকশন টু বায়োলজি, দাশ অ্যান্ড মুখার্জীর আউটলাইনস অব বায়োলজি এ সি দত্তর এ ক্লাস বুক অব বটানি, মুখার্জি ও গাঙ্গুলির জেনারেল বটানি এবং মুখার্জির টেক্সট বুক অব জুলজি। এ ছাড়া শিক্ষক মহাশয়ের দেওয়া নোট —চন্ডীচরণ চ্যাটার্জির বিখ্যাত বই থেকে। ইংরেজি মিডিয়ামের ছাত্র হীরক একটি বাংলা বইও পড়ে—পাল ও রায়-চৌধুরী। ফিজিক্যাল সায়েন্সে পড়ে—চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তর বই—ইংরেজি ও বাংলা দুই-ই, আর সিনহা-রায়চৌধুরীর ইন্টারমিডিয়েট ফিজিক্স; পি কে দত্তর এবং ল্যাডলি মিত্রর কেমিস্ট্রি।

অঙ্কে হীরক স্কুলের টেক্সট কেশব নাগ ছাড়াও কে পি বসু ও টেস্ট পেপার্স ব্যবহার করে। অতিরিক্ত বিষয় মেকানিকসে লোনি-র সঙ্গে দাশ-

মুখার্জি ও ধীরেন ভট্টাচার্য। ভূগোলে ডঃ এস পি চ্যাটার্জি, ইন্ডিয়া ১৯৭৭ আর এল সিং। এবং লোকেশ চক্রবর্তী ও ডঃ চ্যাটার্জির বাংলা বই দুটি। ইতিহাসে মহাজন, ডঃ নিমাইসাধন বোস, ডি এন কুন্দ্রা, ডঃ রমেশ মজুমদার ও ডঃ কিরণ চৌধুরী।

ইংরেজিতে হীরক টেক্সট ভাল করে পড়ে, সিনোনিম, অ্যান্টোনিম ইত্যাদি অভ্যাস করে। শিক্ষকদের কাছ থেকে ও টেস্ট পেপার্স থেকে প্রশ্ন নিয়ে উত্তর লিখে সেগুলি শিক্ষকদের দিয়ে দেখিয়ে নেয়। সংস্কৃতে আগের বারের কৃতীদের মধ্যে একজন ৯৩ পেয়েছে। সে গোটা উত্তর-পত্রটা সংস্কৃত ভাষাতেই লিখেছিল। হীরকও সেই চেষ্টাই করছে। সংস্কৃতে ও পড়ে 'হেল্পস টু দা স্টাডি' ও দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত ব্যাকরণ কৌমুদী।

আনন্দমেলা নিয়ে হীরকদের লাইব্রেরিতে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। মজার পড়া, ধাঁধা ও লেখাপড়া হীরকের খুব প্রিয়। লেখাপড়া বিভাগ থেকে যে ও শুধু অনেক বইয়ের কথা জানতে পেরেছে তা নয়, ওর মতে এটা অন্য স্কুলের অগ্রসর ছেলেদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার একমাত্র উপায়।

হীরক 'অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে'-র দলে নয়। ক্রিকেট ও টেবল টেনিস খেলে। যোগব্যায়াম অভ্যাস করে। ম্যাগাজিনে সুন্দর ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেছে—আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের উপর। শুধু তাই নয়, রেড ক্রসের স্থানীয় শাখা আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। এ-ছাড়া ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতাতেও অংশ নেয়। এবং বি আই টি এম আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় ওদের স্কুলের যে দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ও তার মধ্যে ছিল।

বিদ্যাপীঠে হীরক পড়ছে সেভেন থেকে, তার আগে মাইথন ভ্যালি স্কুলে পড়ত। একবার এইট-এ ছাড়া আর সেকেন্ড হয়নি। ১৯৭৯-র মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও হীরক তার ট্রাডিশন বজায় রাখতে পারবে কি?

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

(একত্রিশের পাতার পর)

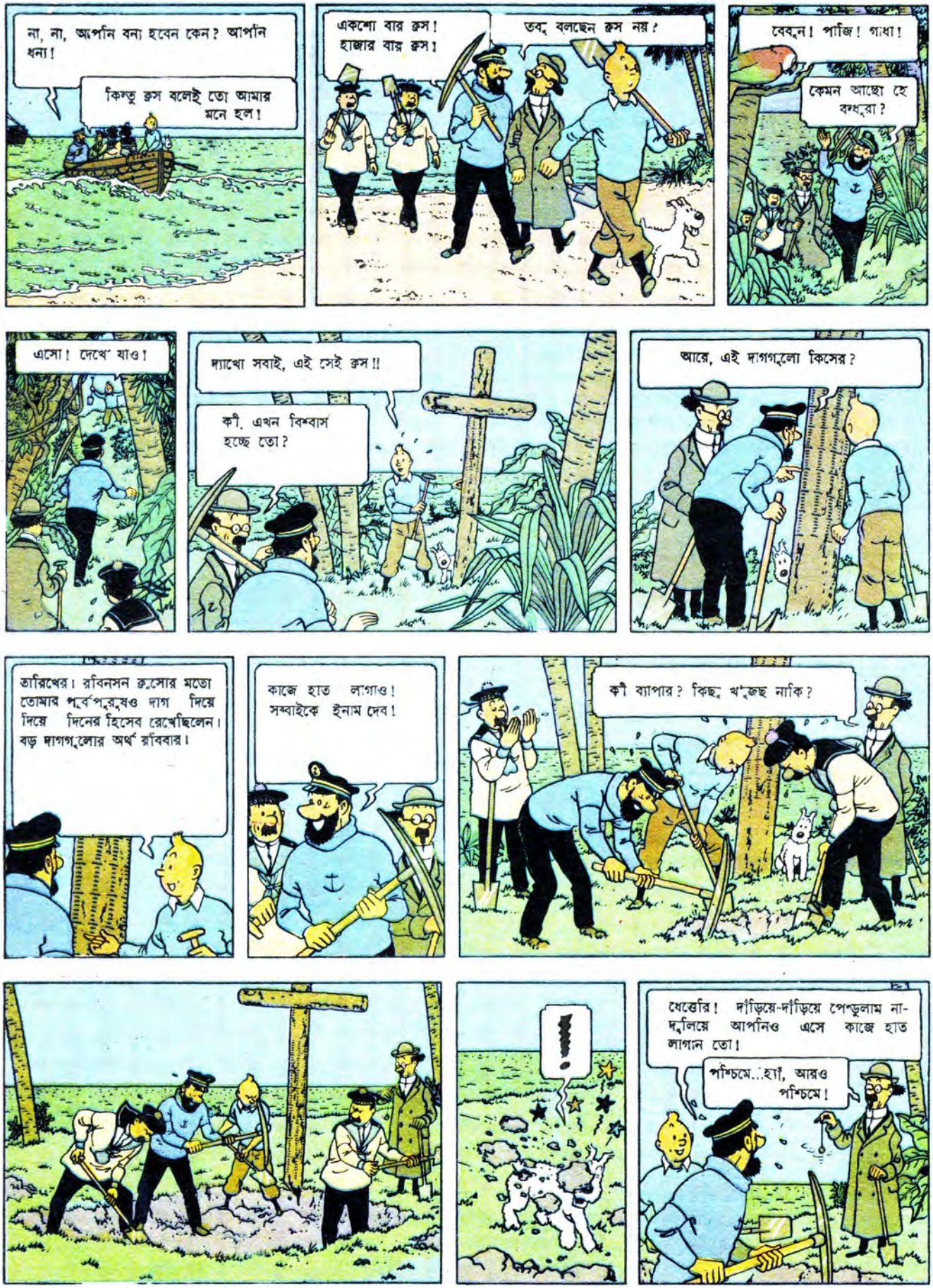

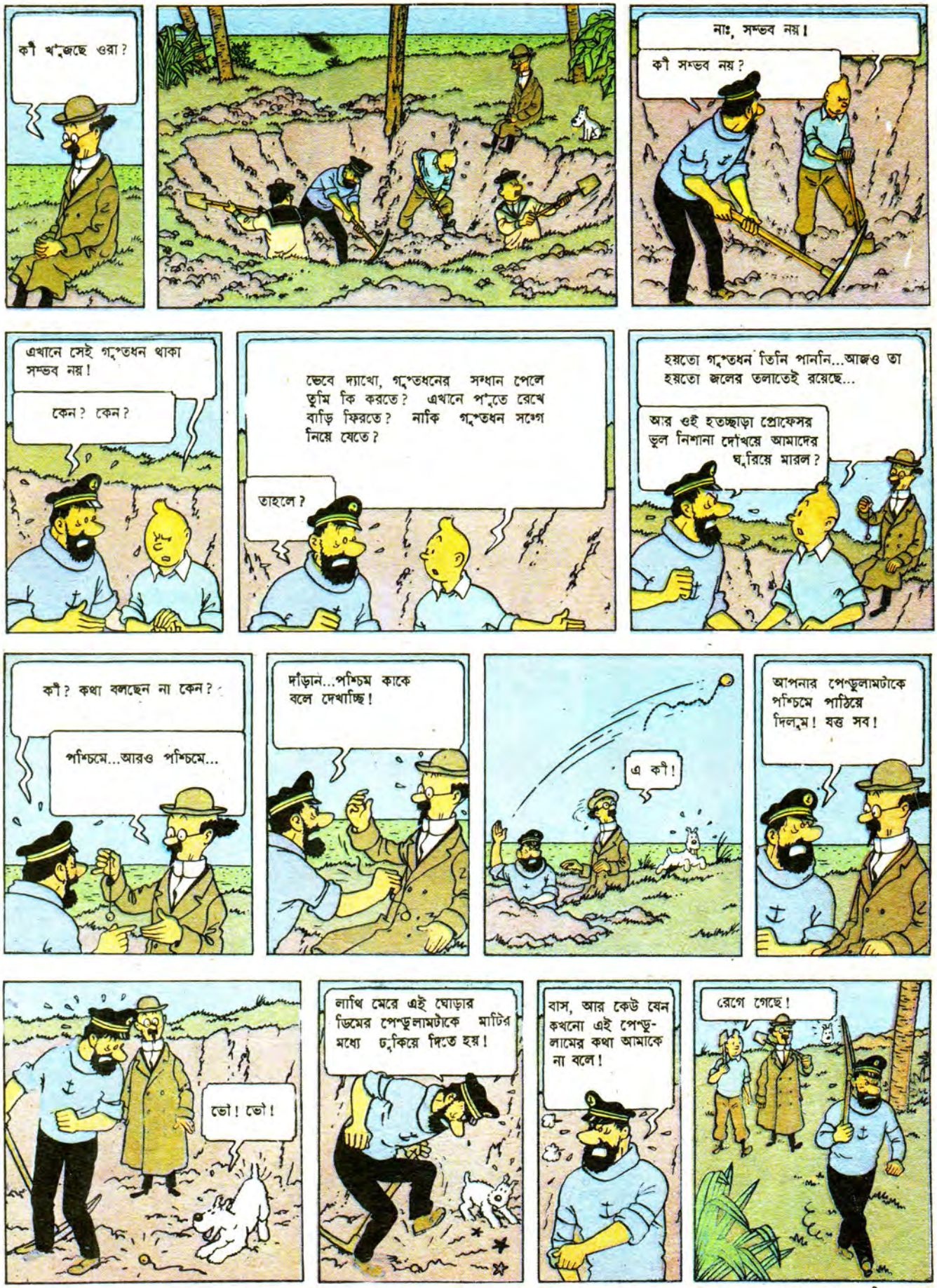

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

গোয়েন্দা বাজ

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

ভুতুড়ে কুকুর

আশাপূর্ণা দেবী

আগে যা ঘটেছে

বজ্রাঙ্গসুন্দরের বয়স সত্তরের বেশি। চিরকাল তাঁর শখ ছিল, একটি তেজীয়ান কুকুর পুষবেন। ছবির মতো বাড়ি করেছেন, কিন্তু হায়, তাঁর জ্যাঠাইমা সিংহবাহিনীর আকন্দপদ্ম কুকুর পুষবার উপায় নেই। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলার ভ্রমণ সেরে বাড়িতে ফিরে বজ্রাঙ্গসুন্দর একটি কুকুর দেখতে পান। মস্ত অ্যালসেশিয়ান, কিন্তু বেওয়ারিশ। জ্যাঠাইমা বলেছেন, না-পুষলেও কুকুরকে খাবার দিতে দোষ নেই। খাবার দিতে গিয়ে কুকুরটিকে কিন্তু দেখা গেল না। কেন? বজ্রাঙ্গসুন্দর তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে খোঁচা মেরেছিলেন। সেই জন্যেই সে অভিমানে উধাও হল নাকি? কিন্তু রাত্তিরে আলমারি খুলে কী দেখেন বজ্রাঙ্গ? তাঁর মশারিতেই বা কিসের খোঁচা? এবং বাড়ির জামাতা গোবিন্দগোপালই বা রাত্তিরে খাওয়ার পরে বাগানের দিকে তাকিয়ে কী দেখে আর্তনাদ করে ওঠেন?

তারপর—

৩

কী হল? কী হল? অ্যাঁ, হলটা কী?

হুমড়ে পড়ল সবাই। চেয়ার ঠেলে নিয়ে সরে এসে সিংহবাহিনীও। কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না হলটা কী! গোবিন্দগোপাল শুধু বাগানের দিকে আঙুল দেখিয়ে হাঁপাচ্ছেন। বজ্রাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, আর গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে আসা ফটিক, সবাই মিলে ওঁকে তুলে দাঁড় করানোর পর তিনি হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠলেন, "কী হল? জানেন না? বা-বা, বাড়িতে বাঘ পুষে রেখেছেন? নেকড়ে বাঘ!"

বাঘ! নেকড়ে বাঘ! বাড়িতে!

বজ্রাঙ্গ প্রায় ধমকে ওঠেন, "কী বলছ যা তা?"

"যা তা?" তেজীয়ান গোবিন্দগোপাল সেই তেজের গলায় বলেন, "যা বলছি ঠিকই বলছি। আপনারা হয়তো আদর করে বলবেন, কুকুর। কিন্তু আমি বলব নেকড়ে। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর! অথচ বাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে 'পরীর ওড়না'। আর সে-বাড়িতে নেকড়ে ছেড়ে রেখেছেন। এ-বাড়িতে আমি আর এক ঘন্টাও নয়!"

হাঁপাতে-হাঁপাতে এঁটো হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে সোজা দাঁড়ান গোবিন্দগোপাল।

দেখে শুনে আর-সবাই তো থ।

কুকুরই বা কাকে বলছেন তাঁরা?

রিংকুর মা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে ওঠেন, "কোথায় ওই বাঘটাঘ জামাইবাবু? কোথায় দেখলেন?"

"কেন, ওই তোমাদের শখের বাগানে।" গোবিন্দগোপাল আরও রেগে গিয়ে বলেন, "শখের বাগানে শখের বাঘা চেন-ছাড়া হয়ে বেড়াচ্ছে! উঃ, যে করে আমার দিকে তাকিয়েছে। কুকুরও নয়, বাঘও নয়, স্রেফ শয়তানের চোখে।"

তবে কি? তবে কি? ফটিকের সঙ্গে বজ্রাঙ্গর চোখো-চোখি।

বজ্রাঙ্গ আর ফটিক ছাড়া সন্দেহটা কেউ করল না। কিন্তু তা-ই বা কী করে সম্ভব? এ-বাগানে ঢুকবে সে কোনখান দিয়ে? এই ডাইনিং স্পেস থেকে ছাড়া আর তো ঢোকবার জায়গা নেই। তাও তো গ্রিলের গায়ের দরজায় তালা লাগানো। আর সে কি এতগুলো লোকের চোখ এড়িয়ে অলক্ষ্যে এসে যাবার মতো?

বজ্রাঙ্গ অবহেলার গলায় বলেন, "ও তোমার চোখের ভ্রম গোবিন্দগোপাল। ঝোপঝাড়ের ছায়া-টায়া দেখেছ বোধহয়।"

চোখের ভ্রম?

জি জি বাজপেয়ীর?

অফিসে যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে এক ইঞ্চি কাজ এদিক-ওদিক হয় না?

গোবিন্দগোপাল ভারী গলায় বলেন, "চোখের ভ্রম হবার বয়েস আমার হয়নি জ্যাঠামশাই। বরং আপনারই—"

কথা শেষ না হতেই হঠাৎ সিংহবাহিনীর তীক্ষ্ণকণ্ঠ বেজে ওঠে; "বজা, বলি তোর তা হলে আমি সগ্‌গে যাওয়া পর্যন্ত আর দেরি সইল না? সেই লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে বাড়িতে এনে তুলেছিস?"

জ্যেঠিমা!

এইবার বজ্রাঙ্গর তেজের পালা, "বলছ কী তুমি জ্যেঠিমা? অ্যাঁ? লুকিয়ে লুকিয়ে? বজ্রাঙ্গ বটব্যাল লুকিয়ে কাজ করবে? ছি ছি!"

সিংহবাহিনী একটু দপকে গিয়ে বলেন, "তাহলে ওটা এল কোথা থেকে?"

"আসেইনি। গোবিন্দগোপালের রজ্জুতে সর্পভ্রম। ছায়ায় কুক্কুরভ্রম।"

"কী হল? রজ্জুতে সর্পভ্রম? আমার? ফটিক, শিগগির একটা ট্যাক্সি ডাকো। যাও এক্ষুনি।"

ফটিক থতমত খাচ্ছিল, হঠাৎ সেইক্ষণে ঝপ করে লোডশেডিং।

মুহূর্তে সবাই স্রেফ স্ট্যাচু। নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। যে যেখানে দাঁড়িয়ে। সারা মেজেয় তো ভাঙা কাঁচ ছড়ানো।

রিংকুর মা সবদিক সামলাতে আরও কাতর গলায় বলেন, "চোখের ভুল কেন জ্যাঠামশাই, রাস্তার কুকুর-টুকুরও তো হতে পারে। হঠাৎ কী ভাবে ঢুকে পড়েছে- "

অন্ধকারে বজ্র গর্জায়, "ঢুকে অমনি পড়লেই হল বৌমা? বজ্রাঙ্গ বটব্যালের তেমন কাঁচা কাজ? সাড়ে ছ ফুট উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল দিইনি? তার ওপর দু'ফুট কাঁটাতার! ওয়ালে একটা ফুটো পর্যন্ত রাখিনি তা জানো?"

"ফটিক, তোর টর্চটা আন তো," গৌরাঙ্গ শান্তভাবে বলেন, "ব্যাপারটা দেখাই যাক না। এমন মোক্ষম সময় লোডশেডিং হল!"

ফটিকের পকেটেই সর্বদা টর্চ।

জানে তো, যেই লোডশেডিং হবে (মানে হবেই তো হরঘড়ি), অমনি হাঁক পড়বে, 'ফটিক, বাতি জ্বাল!...ফটিক, হ্যারিকেন-গুলো জ্বাল বাবা!...ফটকে, এতক্ষণ করছিস কী? হ্যাজাক দুটো জেলে ফেল না!...ফটিকদা, আলো জ্বালো না; পড়া করছি যে—'

পকেট থেকে টর্চ বার করে ফটিক আস্তে গ্রিলের দরজার ধারে এগিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে বলে, "কই, কিছু তো দেখছি না।"

"দেখবিও না।" বজ্রাঙ্গ বিজয়গৌরবের ভঙ্গিতে বলেন, "না থাকলে আর দেখবি কোথায়!"

কিন্তু গোবিন্দগোপাল ছিটকে ওঠেন, "ওই তো—ওই উঁচু গাছটার ওপর কী ওটা?"

"উঁচু গাছটার ওপর? হাঃ হাঃ হাঃ!" বজ্রাঙ্গ মিলিটারি-হাসি জুড়ে দেন, "উঁচু গাছটার ওপর কুকুর! কুকুর আবার

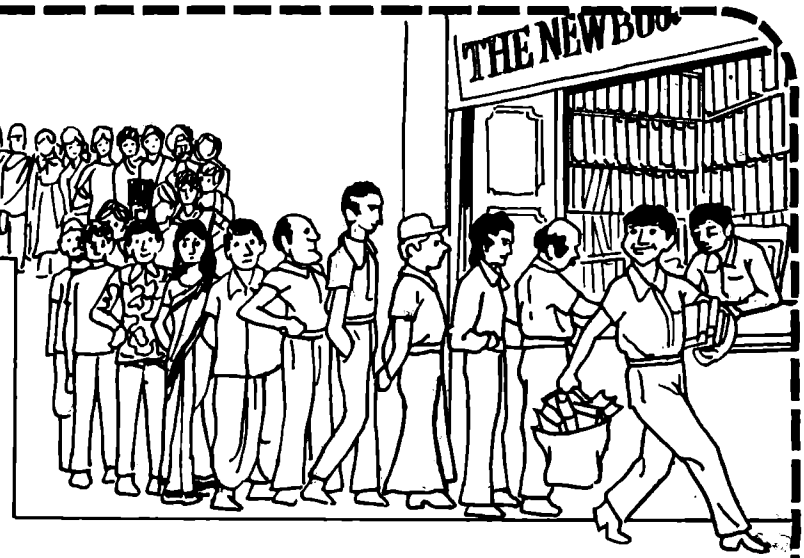

অমিতায়ুর কাছ থেকে:

নীলাঞ্জন চা,

খুব চালাক হোয়েছিস! তোর চিঠি পেয়েছিলাম সময় মতোই, তবে যেতে পারিনি রে! আমাদের বাড়ীতেও একই মজা! সৌগত দাদা আর দিদিও তো এবারে পরীক্ষা দিয়েছিলো মাধ্যমিক! ওরাও ভীষন ভালো করে পাশ করেছে। দিদি ইতিহাস নিয়ে ভবিষ্যতে পড়তে চায়, তাই পরীক্ষার পর থেকেই ডঃ দিলীপকুমার ঘোষের 'ইউরোপ ও পৃথিবী' আর 'আধুনিক ভারতের ইতিহাস' পড়তে শুরু করেছে, অসীম কাকুতো ইতিহাসের অধ্যাপক—কোলকাতার বড় একটা কলেজের; তিনিও দিদিকে বললো ঠিক বই বেছেছো! বাবা আবার মজা করে বললো, দু'চার বছরের প্রশ্নের উত্তর শিখলেই হবে কারন 'history repeats itself', বাবা মাঝে মাঝে যা এক একটা দেয়—কি বলবো!

যাক্ তোর খবর বল! তোর মোহনবাগান তো জব্বর খেললো!

'আরারাত সেদিন
সারারাত কেঁদেছে'—
কি খাওয়াবি বল?
ভালোবাসা নিস
ইতি
অমিতায়ু

পুঃ—
মেজোমামা বললো—'তোর
নো চিন্তা' খোকনমামা ঠিকই বলেছেন।
ডঃ অলক চক্রবর্তীর '**পদার্থবিদ্যা**', বইটাই
বাজারের সেরা, আরও মজা কি জানিস—
দিদির বই গুলোও প্রকাশ করেছেন,
'দি নিউ বুক স্টল'!
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা—৯
যেখানেই ভালো ভালো বই
সেখানেই—
দি নিউ বুক স্টল!
নিউ বুক স্টল!
বুক স্টল!
স্টল!

দি নিউ বুক স্টল
nbs ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০০৯

কাঠবেড়ালি হল কবে থেকে?...ফটকে—হা হা হা—টর্চটা আরও উঁচু করে দ্যাখ তো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে কিনা। হা হা হা!"

হাসি আর থামতে চায় না।

মনে সাহস, জামাই যতই রেগে যাক, লোডশেডিংয়ের সময় রাত সাড়ে দশটায় নিশ্চয়ই মাল-মোট হাতে নিয়ে গটগটিয়ে চলে যেতে পারবে না। থাকতেই হবে। তারপর? সারারাত ঘুমের পর বিছানায় থাকতে-থাকতে বেড টী'র পেয়ালাটি হাতে পেলেই সব রাগ জল হয়ে যাবে।

তারপর?

তারপর জামাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে হবে, "গোরা, জামাইবাবুর জন্যে কী আনবি আজ? মুরগি? না মাটন? অবশ্য তার সঙ্গে পাঁচরকম মাছ তো আনবিই। ইলিশ, ভেটকি, তপসে, পাবদা আনিস দেখে শুনে। ওদের ওখানে তো মাছ তেমন পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও তেমন টেস্ট নেই।"

তারপরেও কি জামাই ট্যাক্সি ডাকতে বলবে?

জামাইকে বেশ এক হাত ডাউন করে খুব উৎফুল্ল মনে শুতে গেলেন বজ্রাঙ্গ। এখনো 'নী-নী' অন্ধকার। ফটিক সেই তখন ঘরে একটা খুদে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সে কখন ফিনিশ হয়ে গেছে।...তা যাক, বজ্রাঙ্গর অন্য ব্যবস্থা আছে। বাগানের জানলাটা ভাল করে খুলে দিলেন। লোড-শেডিংয়ে তো শুধু আলোই যায় না, পাখাও যায়। তবু বজ্রাঙ্গর শহরতলির এই বাড়িটিতে হাওয়া খেলে এত যে, মাঝরাত্তিরে শীত-শীত করে ওঠে।

এখন জানলাটা ভাল করে খুলে দিলেন বজ্রাঙ্গ, তারপর ড্রয়ার থেকে বার করলেন একটা ব্যাটারি ফিট করা টেবল ল্যাম্প। অনেক খুঁজে-পেতে এটি উনি কিনে এনেছেন। মোমবাতি নিয়ে মশারির কাছে বসতে ভয়। আবার কেরোসিন ল্যাম্পে ঘরে কেরোসিনের গন্ধ, ভুষো, বিচ্ছিরি।

টেবল ল্যাম্পটা টেবিলে বসিয়ে বজ্রাঙ্গ বুদ্ধমূর্তির পিছন থেকে চাবিটা পাড়লেন, বইয়ের আলমারি খুললেন; সেই গতকালকের মতো চার-পাঁচখানা বই বার করলেন, অতঃপর সেই বই-সরানো ফাঁকা জায়গাটার পিছনের দেয়ালে খুট করে একটি বোতাম টিপলেন।

টেপার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানটায় একটা গহ্বর বেরিয়ে পড়ল। একেবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চোস্ত জায়গা, ভয়ের কিছু নেই। অবলীলায় ওই গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলেন বজ্রাঙ্গ আর তারপরই টেনে বার করলেন চমৎকার, চকচকে-পালিশ-করা, সুন্দর একটি হাতবাক্স।

বাক্সটিকে বিছানায় বসিয়ে বজ্রাঙ্গ ড্রয়ার খুলে একটা ফাউন্টেন পেন বার করলেন, আর কে জানে কেন ঠিক সেই সময়ই জানলার দিকে চোখ পড়ে গেল বজ্রাঙ্গর। তক্ষুনি চক্ষুঃস্থির। টারা হবারও অবকাশ নেই।

জানলার গ্রিলের ফাঁকে ও কার মুখ?

বজ্রাঙ্গর চোখে পলক নেই, তারও নড়ন-চড়ন নেই। বজ্রাঙ্গ কি চেঁচিয়ে উঠে বাড়ির সকলকে জাগাবেন? নাকি টেবিল থেকে জলভর্তি কাঁচের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারবেন? নাকি বড় দেরাজ থেকে বন্দুকটাই বার করবেন?...

শেষ অবধি বালিশ ছুঁড়ে মারার কথাও ভাবলেন, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলেন না মিলিটারিম্যান বজ্রাঙ্গ বটব্যাল। শুধু অপলকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময় দেখলেন, মুখটা মিলিয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই।

সত্যিই কি কিছু দেখেছিলেন? না তাঁরও চোখের ভ্রম? চোখের ভ্রমের ছায়া লাগল নাকি বাড়িতে?

নাঃ, শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা হল না। গোবিন্দগোপালকে রাখা গেল না। পরদিনটা যদি বা মুরগি-মশল্লা, ইলিশের পাতু তপসের ফ্রাই, বাগদার মালাইকারির বন্ধনে বন্দী রাখা গিয়েছিল, কিন্তু তার পরদিন আর রাখা গেল না, দ ছেঁড়া হয়ে চলে গেলেন গোবিন্দগোপাল ট্যাক্সি ডাকিয়ে। আ পাঁচদিন ছুটি ছিল, তা থাক; ঝামাপুকুরে তাঁর খুড়তু মাসির ছেলের বাড়িও আছে।

কুসুমবিথানের 'পরীর ওড়না' ছেড়ে ঝামাপুকুর।

রিংকুর মা একবার বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জ হল না। বজ্রাঙ্গরও তো সেই হাহা-হাসির জেল্লাটি নেই!

থাকবে কোথা থেকে? কাল মাঝরাত্তির থেকে বাকি রা বীভৎস কুচ্ছিত সুরে কুকুরের ডাক চলেছে।...

সেই ঘোঘো, ঘ্যাক-ঘ্যাক, ঘোঘো, ঘ্যাক-ঘ্যাক। ছেদ ে ভেদ নেই।...অথচ কুকুর কোথায় তারও ঠিক নেই। আর দে ঘায় না তাকে গেটে। ভোরের দিকে থামল। কিন্তু এমন এনা কারুর হল না যে, সকালের আলোয় একবার তল্লাস করে দে কাজেই মুখটি মলিন করে গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁর জামাইবাবু ঝামাপুকুরে পৌঁছে দিয়ে এলেন। জামাইবাবুর মুখে বিজ গৌরবের আহ্লাদ! রজ্জুতে সর্পভ্রম? ছায়াতে কুকুরভ্রম গোবিন্দগোপালের?

সিংহবাহিনী সেই অদৃশ্য কুকুরটাকে গালমন্দ করতে-কর কাঁদতে লাগলেন। "আহা, জামাইকে আজ মোচার ঘণ্ট খাওয় ভেবেছিলাম গো!...মোচা কুটে পর্যন্ত রাখা আছে।"

কিন্তু—তারপর?

তার পরের দিন? তারও পরের দিন? সেই কান্ন অশরীরী প্রাণীর অজান্তব একটা আওয়াজ।

আর তার পরের দিনই ঘটল সেই দুর্ঘটনা।

সকালবেলা দেখা গেল বজ্রাঙ্গসুন্দর বটব্যাল সকা

কেমন বাঘ

দেবাশিস বসু

ঝুমি-র আছে খেলনা-গাড়ি
যখন সে যায় বাইরে
খেলনা-ঘোড়া ছোটায় তাকে
সে গায় তাইরে নাইরে।

যখন ফেরে, তখন বাড়ির
দরজা খুলে দেয় যে-দ্বারী
সে পোষে এক কাগুজে বাঘ
নাম নাকি হিমশীতল,

মাংস দিলে ছোঁয় না মোটে
সে শুধু খায়, যখন জোটে,
খাগড়া থেকে কিনে আনা
সোনার কাঁসা-পিতল!

বিছানা ছেড়ে আর উঠলেন না। সবাই এসে দেখল, শুয়ে আছেন বিছানায়, চোখ দিয়ে বোধহয় জল পড়েছে, হাত-পা স্থির।

বেলা আড়াইটে

বেনারসের মিছরিপোখরার নাম-করা ডাক্তার এস এস বটব্যাল সবে 'কল' সেরে বাড়ি ফিরে গাড়ি থেকে নামছেন, দরজার সামনে এক পিয়ন।

"ডাগ্‌দার সাব, টেলিগিরাপ।"

ডাক্তার সাবের বুকটা ছাঁত করে উঠল।

উঠবেই! বাঙালি তো? বাঙালি মাত্রেরই আচমকা 'টেলিগ্রাম' শুনলেই বুকটা ছাঁত করে ওঠে!

বটব্যাল কাঁপা হাতে সইটা করে টেলিগ্রামখানা নিলেন বটে, কিন্তু চট করে খুললেন না। না খুলেই তো বুঝতে পারছেন ভিতরে কী খবর আছে। অবিশ্যি একদিন যে এ খবর আসবেই সে তো জানা কথাই। সত্যি, মানুষ তো আর অমর নয়? তিরেনব্বুই...পঁচানব্বুই...সাতানব্বুই...নাহয় একশোই হল, উজবেকিস্তানে কি কাজিকিস্তানে জন্মালে নাহয় একশোর ওপরই গোটাকতক বছর পাওয়া গেল। কিন্তু তারপর? তারপর তো আর নয়?

বটব্যাল ব্রাদাররা যদি জগতের এই সার-সত্যটি জেনেও শোকে অভিভূত হন, উপায় কী?

ডাক্তার-গিন্নি বলেন, "টেলিগ্রামটা না-পড়েই হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসলে? পড়েই দেখো।"

ডাক্তার বটব্যাল নিশ্বাস ফেলে বলেন "দেখে আর কী হবে, যা আছে তা তো বুঝতেই পারছি। জ্যেঠিমা আর নেই।"

"কী আশ্চর্য্য! তবু দেখবে তো? কবে ঘটল ঘটনাটা, কবে যেতে হবে—"

তা বটে! কথাটার যুক্তি অনুভব করে ডাক্তার বটব্যাল টেলিগ্রামটা খোলেন, কিন্তু এ কী? এ সব আবার কী বিদঘুটে কথা। একবার, দুবার, তিনবার; পড়তেই থাকেন। মানুষ যে অমর নয়, সে খবর কোথা?

ডাক্তার-গিন্নি ডুকরে ওঠেন, "অমন আড়ষ্ট হয়ে গেলে কেন? বাংলা করে বুঝিয়ে বলো কী লেখা আছে। অত সব কথা কী লেখা আছে?"

"ওঃ, আচ্ছা বলছি।"

বাংলা করে বুঝিয়ে দেন ডাক্তার-সাব তাঁর গিন্নিকে। তারবার্তাটি এই—

'অবিলম্বে চলে এসো। এবং সঙ্গে নিয়ে এসো কাশীর কোনো নামকরা পণ্ডিত জ্যোতিষী, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব চোখে দেখতে পান। বাড়িতে ভয়াবহ অবস্থা, জীবন মহানিশা।...তোমার রোগীদের সম্পর্কে চিন্তা করে বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। তাদের পরমায়ু থাকলে তোমা বিহনেও বেঁচে উঠবে, বেনারসে ডাক্তারের অভাব নেই। আর পরমায়ু না থাকলে তুমি দিনরাত জেগে তাদের নাড়ী ধরে বসে থাকলেও মরণ আটকাতে পারবে না। কাজেই—'

শুনে ডাক্তার গিন্নি তো অবাক।

চিরটা কাল দেখে এসেছেন, টেলিগ্রাম করতে হয় শর্টকাটে। কত সময় তো ভাল করে মানেই বোঝা যায় না। আর এ একেবারে যত ইচ্ছে চালিয়েছে। অবাক হয়েই বলেন, "টেলিগ্রামটা করেছে কে?"

করেছে—করেছে—আরে এতক্ষণ দেখা হয়নি, প্রেরকের

যারা কচি কাঁচা তাদের ত্বকের

নিরাপত্তার জন্য চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

ছোটদের নিয়ে মেলাই ঝক্কি ঝামেলা। আর এক দুর্ভাবনা তাদের কোমল ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষা। জীবাণু সংক্রমণের ভয় তাদের ক্ষেত্রেই বেশি। মায়েদের সব ভাবনা থেকে ছুটি দিল বোরোলীন। কাটা ছেঁড়া ফাটায় অনবদ্য। রুক্ষ, শুষ্ক কিংবা ঝলসানো ত্বকেও অদ্ভুত কাজ করে

বোরোলীন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড • বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৭০০ ০০৩

নামের জায়গায় লেখা 'জ্যেঠিমা'।

জ্যেঠিমা টেলিগ্রাম করেছেন। এ কী আশ্চর্য্যি!

ডাক্তার বটব্যাল বলেন, "জ্যেঠিমার পক্ষে আশ্চর্য্যি বলে কিছু নেই। নিশ্চয় দাদাকে কি গোরাকে না-জানিয়ে পাড়ার কাউকে দিয়ে টিয়ে—কিন্তু এখন জ্যোতিষী কোথায় পাওয়া যায় ? তাও আবার নাম করা !

গিন্নিরা চিরদিনই কর্তাদের বুদ্ধির জোগানদার, তাই ডাক্তার গিন্নি চটপট বলে ওঠেন, "কেন, ওই যে ভৈরব জ্যোতিষী। দশাশ্বমেধের ঘাটের ধারে বসেন, সাইনবোর্ডে লেখা দেখনি—পণ্ডিত ভৈরব আচার্য, জ্যোতিষ চূড়ামণি জ্যোতিষার্ণব, জ্যোতিঃশাস্ত্রী।"

'পরীর ওড়না' একতলা হলেও ছাতে একটা ছোট ঘর আছে, যাকে বলে চিলে-কোঠা। ভরদুপুরে সেই ঘরের মধ্যে দুটি প্রাণী গভীর গবেষণায় মগ্ন। ঘরের দরজাটি ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে গুপ্ত পরামর্শের উপযুক্ত করে নেওয়া হয়েছে. শুধু ওদিকের উঁচু দেওয়ালের গায়ের সবেধন নীলমণি খুদে জানলাটি দিয়ে মাঝে-মাঝে দুপুরের গরম হাওয়ার ঝাপটা এসে ঢুকছে। তাতে কিছু অবশ্য এসে যায় না এদের। তুচ্ছ শীতগ্রীষ্ম-বোধকে জয় করতে না পারলে জগতে কোনো মহান সাধনার সিদ্ধি হয় না।

দুজনেই খুব গুজগুজ করে কথা বলছে, তবু মাঝে-মাঝে এক-একটা কথা ছিটকে উঠছে। যেমন, "তুই বলছিস বটে দাদা, কিন্তু আমার অবিশ্বাস আসছে।"

এতে অপর কণ্ঠও একটু ছিটকে ওঠে, "অবিশ্বাস আসছে? গোয়েন্দা-গল্পগুলো তাহলে পড়িস কী করতে? হেডুচন্দ্রের মধ্যে তো কিচ্ছুই ঢোকে না দেখছি।"

অপর কণ্ঠ খাদে, কী যে বলে বোঝা যায় না।

এ-কণ্ঠ উত্তপ্ত, "কী কী পড়েছিস শুনি?"

খাদে-নামা স্বর খাদেই থাকে, তথাপি নীরব নয় তা বোঝা যাচ্ছে। একবার একটু শোনা যায়, "হ্যাঁ, ও দুটো তো পড়েছি। কিন্তু—"

"পড়েছিস তবে ? মনে নেই বুঝি ? ওঃ, মাথা চুলকোনো শুরু হয়ে গেল। নাঃ, তোকে নিয়ে যে কী বিপদে পড়তে হবে কে জানে। শেষে না সব গুবলেট হয়ে যায়। 'দীপঙ্করের নতুন রেকর্ড' বইটায় পড়িসনি গোয়েন্দা দীপঙ্কর নাগ চৌধুরী কীভাবে একটা খরগোশের ছদ্মবেশে, ঘরের ভেন্টিলেটার দিয়ে ঢুকে পড়ে একটা বিরাট ব্যাঙ্ক-ডাকাতির পুরো গ্যাংটাকেই ধরে ফেলেছিল।"

"আরে বাস! খরগোশের? য্যাঃ!"

"অমনি য্যাঃ ! বইগুলো তাহলে তুই মোটেই পড়িস না দেখছি, শুধু কায়দা দেখাতে ধরে বসে থাকিস। গোয়েন্দারা কী না পারে ? ওদের অসাধ্য কিছু আছে নাকি ? চোর-ডাকাতরাও অবশ্য অনেক কিছু পারে। 'দীপঙ্করের আর এক কীর্তি'তে দীর্ঘদেহী কাবুলিওয়ালা রহিম বক্স কীভাবে একটি জাপানি মহিলার ছদ্মবেশে চোরাই সোনা নিয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আন্দামানে পালাচ্ছিল ?...তবে দীপঙ্করের কাছে তো আর জিততে হয় না ?...সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর নাগ চৌধুরীও একটি অতিকায় অজগরের খোলশের মধ্যে ঢুকে পড়ে জাহাজে হানা দিয়ে হুলুস্থুলু বাধিয়ে সেই সোনা উদ্ধার করে দিলেন। হয় এরকম রে।"

"তা বলেছিস দাদা ঠিকই," তিরস্কৃত ব্যক্তি এক গাল হেসে বলে ওঠে, "আমাদের মাকড়দা গ্রামের শশী গড়াই তো চিরটা কাল 'কচিখোকা'টি সেজে রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে—হাফটিকিটে চালিয়ে এল। গোঁফদাড়ি পেকে গেছে যখন, তখনও। অবিশ্যি কামিয়ে ফেলত। পাকা মাথায় সোলা হ্যাট। রেলগাড়ির জন্যে একটা হাফ প্যান্ট ছিল শশী গড়াইয়ের, একটা সোলা হ্যাট ছিল আর একটা বেটে শার্ট। সেইগুলোকে টেনে বুনে গায়ে মাথায় চাপিয়ে দিব্যি ল্যাবানচুষ চুষতে-চুষতে আসা-যাওয়া করত মাকড়দা থেকে কলকাতায়, আবার কলকাতা থেকে মাকড়দায়। গোঁফ-দাড়ি তো থাকত না। টিকিট চেকার ধরতে পারত না।"

"হি হি হি, তাই বুঝি ?" হেসে উঠেই মুখে আঙুল দেয় পরামর্শকারী।

আস্তে বলে, "ভুলে চেঁচিয়ে হেসে ফেলেছি। কাগজটা আর একবার দেখা যাক। ভাগ্যিস তুই এটা কুড়িয়ে পেয়েছিলি ফটিকদা। ইশ, আবার ফটিকদা বলে ফেলছি। এখন থেকে তুই মাকড়শা, আর আমি বঙ্কাদা।"

"মাকড়শা? আমার জন্যে একটা ভাল নাম হল না বঙ্কাদা ?"

বঙ্কাদা গম্ভীরভাবে বলে, "ওই তোর মাকড়দার সঙ্গে মিল থাকল আর কী।"

এরপর ওরা অনেকবার দেখা সেই কুড়িয়ে পাওয়া কাগজটা আবার সাবধানে মাটিতে বিছিয়ে ধরে।...সাবধান তো করতেই

হবে, কাগজ মানে তো আর রিংকুর খাতার কাগজের মতো সাদা ধবধবে নয়। ময়লা চিরকুট্টি একটা বোধহয় পানটান-মোড়া কাগজের দু' পিঠে লাল পেন্সিলে খুদে-খুদে আর বিচ্ছিরি হাতে লেখা—

১। বুড়ির হেড এক জাঁদরেল বুড়ি। বয়েস একশো, মেজাজে বেগম রাজিয়া, গলার স্বর সাইরেন, নাম সিংহী।

২। বুড়ির ছেলে বা কেউ—এক বুড়ো। বয়েস সত্তর পঁচাত্তর, চেহারা নবাব আলিবর্দী, মেজাজ খাপ্পা খাঁ। গলা বাজখাঁই. নাম বজ্জর না কী।

৩। বুড়ির নাতি। বয়েস চল্লিশ-মতো, চেহারা ভাল, স্বভাব মিষ্টি, গলা নরম, নাম গৌর।

৪। নাতির ছেলে—বয়েস বারো তেরো, নাম ফিঙে না টিংটিঙে কী যেন, দেখতে সুন্দর, স্বভাবে বিচ্ছু নম্বর ওয়ান।

৫। বাড়ির কাজ করার লোক। বয়েস উনিশ-কুড়ি। দেখতে প্যাঁকাটি, নাম ফটকে, স্বভাব—লঙ্কা তেজপাতা নিমকাঠি আর কাঁচা তেঁতুলের মিক্সচার।

৬। একটা জামাই না কে এসেছিল, চলে গেছে। কিম্ভূত-কিমাকার। ওর জন্যেই এতটা হৈ চৈ।

৭। নাতবৌ। নাম জানি না। বয়েস বোঝা যায় না, চেহারা লক্ষ্মী-প্রতিমা। হাতের রান্নার গন্ধে পাগলা করে ছাড়ে।

৮। গেস্টের ঘর বাদে সব ঘর এক ডিজাইনের। জানলা দরজা সব। ঘরে-ঘরে একই ডিজাইনের খাট আলমারি চেয়ার টেবিল, আর বই-ঠাসা দেওয়াল-আলমারি। বোঝবার জো *নেই কোনটা কী, তবে 'স্পেশালটি' ওই বুড়োর ঘরে।* চালাকি খুব, সব ঘরে বুদ্ধ-পুতুল।

পড়া যেত না, নেহাত লাল পেন্সিল বলেই কোনোমতে পড়া গেছে।

"মাকড়শা, বুঝছিস আমার সন্দেহ ঠিক কিনা ?... কাগজটার ওপর কাদা-কাদা পায়ের ছাপ দেখছিস ? কিসের পায়ের ? মানুষের ? গোল-গোল বলের মতো ছাপ মানুষের হয় না। শুধু—কে ? কে দোর ঠেলছ ?"

দোরে বারবার টোকা পড়ে।

তাড়াতাড়ি কাগজ গুটিয়ে হাত ঝেড়ে উঠে পড়ে ওরা। কে ধাক্কা দিচ্ছে! খুলবে না শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

নাঃ, থাকা গেল না। রিংকুর বাবার ব্যস্ত গলা বেজে উঠেছে. "কী করছিস তোরা এখানে ? কাশী থেকে দাদু দিদা এসেছেন!"

দাদু দিদা ! কাশী থেকে !

এক লাফে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে গলদঘর্ম রিঙ্কু আর তার পিছু পিছু চোরের মতন হেঁটমুণ্ডে ফটিক।

কিন্তু নীচের তলায় এ কী ব্যাপার চলছে ?

দাদু দিদার সঙ্গে ও লোকটা আবার কে ? সবাই মিলে কত্তামার ঘরেই বা ভিড় করেছে কেন ? আর দাদুদের সঙ্গে আসা ওই কপালে-সিঁদুর-টিপ-পরা পুরুষ মানুষটা ভাল কার্পেটের আসনের উপর হাঁটু উঁচু করে বসে ইয়া মোটা একটা মর্তমান কলায় কামড় দিচ্ছে কেন ? সামনে একটা থালায় আরও একগাদা অমনি মোটকা-মোটকা কলা সাজানো। সবগুলো ওই লোকটা একা খাবে না কি ?

তা সন্দেহ মিথ্যা নয়, তাই খেলেন ভৈরব পণ্ডিত একটির-পর-একটি। শুধু মাঝে একবার প্রশ্ন করেছিলেন "পুরা ষোলা হ্যায় তো ?" (ক্রমশ)

ছবি সুধীর মৈত্র

মণিমেলার খবর

মণিমেলা মহাকেন্দ্র কর্তৃক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত বাংলা ও ইংরেজি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। মোট আটটি বিভাগে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ৮২টি বিদ্যালয় ও ২৫টি সংগঠন থেকে ৩৬৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে।

বিভিন্ন বিভাগে যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারা হল : বাংলায়—রুম্পা গুঁই (রামকৃষ্ণ সারদা মন্দির, আলম-বাজার) ; অপর্ণা সেনগুপ্ত (যাদবপুর কলোনি মণিমেলা); জুলেখা যশমিন (অনামিকা মণিমেলা, কল্যাণী) ; শর্বরী রায় (কলকাতা); মৃণাল কর্মকার (কানাইলাল বিদ্যামন্দির, হুগলি); মনুয়া চন্দ (কসবা মণিমেলা)। ইংরেজিতে—প্রবল চক্রবর্তী (যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল), ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী (সরোজ-বাসিনী শিশু বিদ্যালয়, বীরভূম), রিনি কুন্ডু (কারমেল হাই-স্কুল), সুব্রত সেনমজুমদার (সেন্ট জেভিয়ার্স হাইস্কুল), শান্তনু চক্রবর্তী (সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুল) ও মনুয়া চন্দ (কসবা মণিমেলা)।

আঞ্চলিক সংবাদ

শ্যামনগর ও আসানসোল অঞ্চলের প্রাকনায়ক প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। আসানসোল আঞ্চলিক খো খো লীগ প্রতিযোগিতায় সোনার তরী মণিমেলা বিজয়ী হয়েছে। রেলপার মণিমেলা ও অগ্নিবীণা মণিমেলা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

মণি সন্দেশ

নিমতার নারায়ণপল্লী মণিমেলা স্থানীয় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। মেদিনীপুরের ঘাটাল মণিমেলা বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে: জগদ্দলের নবমিতালী মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বর বেলুড় মঠ ও শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে এক শিক্ষা ভ্রমণে গিয়েছিল। হাওড়ার সপ্তর্ষি মণিমেলা শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান পালন করে। নিমতার নারায়ণপল্লী মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি বিড়লা মিউজিয়াম ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে এল।

মেদিনীপুরের ঘাটাল মণিমেলার ভাইবোন ও কর্মীরা মেদিনীপুর জেলা জিমন্যাসটিকস প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার ও জুনিয়ার উভয় বিভাগেই বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেছে। আসানসোলের সংঘশ্রী মণিমেলার বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। মধ্যমগ্রামের জীবনদীপ মণিমেলার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি উদযাপিত হয়। শেওড়াফুলির সন্ধানী মণিমেলা বার্ষিক উৎসব পালন করেছে সম্প্রতি। নৈহাটি মণিমেলার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে কিছুদিন আগে।

ভাস্কো-ডা-গামা

ইউরোপের মানুষেরা অনেকদিন থেকেই জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতে আসার চেষ্টা করছিলেন। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক গল্প শুনেছিলেন তাঁরা। শুনেছিলেন ভারতবর্ষের সম্পদের কথা। সুস্বাদু মশলার খোঁজেও তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা হল ভারতে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করা। পোর্তুগালের রাজা হেনরি এ-বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, ভাস্কো-ডা-গামার অভিযানের অনেক আগে থেকেই অনেক অভিযাত্রী ভারতের সন্ধানে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতার বিবরণ ভাস্কো-ডা-গামাকে ভারতে পৌঁছতে সাহায্য করেছিল।

ভাস্কো-ডা-গামার জন্ম হয়েছিল পোর্তুগালে, ১৪৬০ সালে। তিনি ১৪৯৭ সালের ৮ জুলাই অনেক লোকজন, কয়েকটি জাহাজ ও সে-সময়ের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে পোর্তুগাল থেকে রওনা হলেন। ক্যানারি দ্বীপের পর তিনমাস আর কোনো স্থলভূমির দেখা পেলেন না। সেন্ট হেলেনা উপসাগরে জাহাজ ভিড়িয়ে তাঁরা আটদিন রইলেন সেখানে। তারপর এলেন উত্তমাশা অন্তরীপে। সেখান থেকে উত্তর-দিকে যাত্রা করে একটি নদীর মোহনায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁরা বত্রিশ দিন ছিলেন। জাহাজ মেরামত করা হল, টাটকা খাবার নেওয়া হল, তারপর তাঁরা গেলেন মোজাম্বিক বন্দরে। সেখানে তাঁরা সোনা, রুপো, মণি-মাণিক্য, লবঙ্গ, গোলমরিচ, আদা, ইত্যাদি বোঝাই চারটে আরবদেশীয় জাহাজ দেখতে পেলেন।

২১ মার্চ দু'জন আরবদেশীয় নাবিক সঙ্গে নিয়ে ভাস্কো-ডা-গামা আবার যাত্রা শুরু করলেন এবং মোম্বাসায় এসে পৌঁছলেন।

মোম্বাসা থেকে একদিনের মধ্যেই মালিন্দিতে এসে পৌঁছলেন এবং এখানকার রাজার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেলেন। এবার ভাস্কো-ডা-গামা আর-একজন নাবিক সঙ্গে নিয়ে ২৪ এপ্রিল দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দররে উদ্দেশে রওনা হলেন। তেইশ দিন তাঁরা কোনো স্থলভূমি দেখতে পেলেন না। ১৪৯৮ সালের ২০ মে কালিকটের সমুদ্রের উপকূল থেকে একটু দূরে জাহাজ নোঙর করা হল। এইভাবে ভাস্কো-ডা-গামা সমুদ্রপথে ইউরোপ থেকে ভারতে এসে পৌঁছলেন।

ফিরতি পথে আফ্রিকায় পৌঁছতে তাঁদের তিন মাস লেগেছিল। এই সময়ে স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে তিরিশজন অভিযাত্রীর মৃত্যু হয়। ভাস্কো-ডা-গামা তখন তাঁর একটা জাহাজ পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। ১৪৯৯ সালের জুলাই মাসে ভাস্কো-ডা-গামা পোর্তুগালের লিসবনে এসে পৌঁছলেন।

এই অভিযানে সময় লেগেছিল দু বছর। এইভাবে অনেক অভিযাত্রীর অনেক বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পরে ভারতে যাওয়া-আসার জলপথ আবিষ্কৃত হল।

দিদিমণি

ইংরেজির ইং

ব্যাপারটা কী? চামেলির ইস্কুলের বাসের এখনো যে টিকি দেখা যাচ্ছে না? বাবা-মা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাই দ্যাখো:

Father and Mother are looking out of the window.

কিংবা, তাদের মনের ভাব জানাবার জন্যে এর সঙ্গে আরেকটা কথা জুড়ে দিয়ে বলতে পারি:

Father and Mother are anxiously looking out of the window.

আর চামেলি নিজে?

Chameli is happily playing with Araballi.

এদিকে আবার পাছে বাবা-মা মনে করেন তার ইস্কুলের জন্যে কোন চিন্তা নেই তাই সে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছে:

Chameli: Do you see my bus, Mummy?

Mother: No, my dear, I don't see your bus.

Father: I see buses, but not your bus.

এইবার, দু'ধরনের দুটো বাক্য মিলিয়ে দেখা যাক:

(1) Father *is looking* out of the window.

(2) Father *sees* buses.

(১) নম্বর আর (২) নম্বর বাক্যে তলায়-দাগ দেওয়া শব্দগুলোর তফাতটা লক্ষ করো। এরকম তফাত কেন হল? একটু বুঝিয়ে বলি। আমরা অনেক রকমের কাজ করি। কোনো-কোনো কাজ আমাদের ইচ্ছে করে, কিংবা চেষ্টা করে করতে হয়, কোনো কোনো কাজের বেলায় কোন চেষ্টা লাগে না, এমনিতেই হয়ে যায়। মনে করো, তুমি চাঁদ দেখতে চাও। তা হলে তোমাকে চাঁদের দিকে তাকাতে হবে। যদি তাকাও তাহলে দেখতে পাবে।

If you *look* you can *see*.

আবার সব সময়ে যে আমরা ইচ্ছে করে তাকিয়ে দেখি, তা তো নয়।

ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে যা করতে হয় তার বেলাতে (১) নম্বর বাক্যের ধরনে বলতে হয়:

Chameli *is playing* with her cat.
Chambal *is walking* to school.
Araballi *is purring*.

অর্থাৎ কেউ কিছু একটা কাজ করছে, এইরকম ভাব থাকলে এই ধরনের বাক্য হয়।

আর কাজ করার ভাবটা না-থাকলে (২) নম্বর বাক্যের মতো হয়। যেমন:

I *see* you are happy.
Father *hears* noises from the street.
I *think* you are wrong.
Chameli *understands* Araballi.

কিন্তু কোথায় 'ইং' খাটবে আর কোথায় খাটবে না, সে-কথাটা এবার শেষ হল না। সামনের বারেও চলবে।

প্রসাদ

পরপর চারবার-আবার

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ফুটবলে বাংলার একচ্ছত্র আধিপত্য আর একবার প্রমাণিত হল এবার শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবলের আসরে। ৩৫ বারের এই প্রতিযোগিতায় বাংলা বিজয়ী হল মোট ১৮ বার এবং পরপর চারবার। পরপর চারবার বিজয়ী হওয়ার কৃতিত্ব বাংলা আরও একবার অর্জন করেছিল (১৯৪৭—৫১। ১৯৪৮ সালে ফুটবল আসর বসেনি)। এবারের জয় আরও গৌরবের এই কারণে যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বন্যার খবরে বাঙালি খেলোয়াড়রা সবাই অত্যন্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত ছিলেন।

শ্রীনগরে জাতীয় ফুটবল অনুষ্ঠানের অনেক আগেই বাংলার সাফল্য সম্বন্ধে অনেকেই নিশ্চিত ছিলেন। কারণ এ বছরে গোড়ার দিকে কলকাতায় জাতীয় ফুটবলের আসরে বাংলা ছাড়া আর যে তিনটি দল সেমি-ফাইনালে উঠেছিল, সেই পাঞ্জাব, কেরল ও রেলওয়ের পক্ষে গত বছর যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন এবার অনুপস্থিত। হরজিন্দর ও গুরদেবের অনুপস্থিতির ফলে পাঞ্জাবকে প্রাথমিক পর্বেই বিদায় নিতে হয়েছে। কেরল ও রেলওয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু রেলওয়ে তিনটি খেলায় না পেয়েছে কোনো পয়েন্ট, না করেছে কোনো গোল। আর কেরলের যা-কিছু সাফল্য তা ঐ রেলওয়ের বিরুদ্ধে। নাজিব, জেভিয়ার পায়াস ও দিনকরের অভাব বারবার চোখে পড়েছে। কারণ কেরলের খেলোয়াড়রা গোয়া ও বাংলার বিরুদ্ধে গোলের সুযোগ অভিজ্ঞতার অভাবে কাজে লাগাতে পারেনি।

অভিজ্ঞতাই যদি সাফল্যের মূল কারণ হয়, তাহলে বাংলার জয়লাভ সহজ হবে এটাই আশা করা হয়েছিল। বাংলা দলে ছিল নামী খেলোয়াড়ের ভিড়। তাছাড়া, গত চার মাস কলকাতা ফুটবল লীগে অংশ নিয়ে খেলোয়াড়রা নিজেদের অনেকখানি প্রস্তুত করেছিলেন। আশা ছিল, বাংলা দল প্রায় প্রতিটি খেলাতেই অধিক সংখ্যক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশা পূর্ণ হয়নি। গত চারটি জাতীয় ফুটবল আসরের মধ্যে বাংলা এই প্রথম একটি খেলায় পরাজিত হয়।

জাতীয় ফুটবলের ফাইনাল। আক্রমণ করছেন

আকবর ও পেরেরা মুখোমুখি

প্রতিযোগিতায় ন'টি খেলায় অংশ নিয়ে গোল করেছে মাত্র ১৮টি। গোল খেয়েছে ছ'টি। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের হাতেই তিনটি।

গোয়া ও মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলা মোট চারবার খেলেছে। গোয়ার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের খেলায় বাংলা ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ২—০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারেনি। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে গোয়ার পক্ষে সেদিন জয়লাভ করা অসম্ভব ছিল না। বাংলার রক্ষণভাগ যে কত ভঙ্গুর তা সেদিনের শেষ পনেরো মিনিট বুঝিয়ে দিয়েছে। গত চারটি জাতীয় ফুটবল আসরে উপস্থিত থেকে লক্ষ করেছি যে, বাংলা ও গোয়া যখনই মিলিত হয়েছে তখনই খেলার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছে। ১৯৭৫ সালে ক্যালিকটে গোয়া-বাংলার খেলাটি শেষ হয়েছিল ১—১ গোলে। দুটি গোল গোয়াই করেছিল। সমাপ্তির মিনিট কয়েক আগে গোয়া যদি আত্মঘাতী গোল না করত তাহলে সেদিন বাংলাকে পরাজয় স্বীকার করতে হত। ১৯৭৬ সালে পাটনায় বাংলা গোয়াকে হারিয়েছিল ২—০ গোলে। সে খেলাতেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। গত বছর অবশ্য বাংলা গোয়ার সঙ্গে খেলেনি।

বাংলা-গোয়া ফাইনাল খেলায় বাংলারই ছিল আধিপত্য। তবু বাংলা এই খেলায় শেষ পর্যন্ত জিতেছে মাত্র ১—০ গোলে। আর তার জন্য দায়ী বাংলার ফরোয়ার্ডরা, বিশেষ করে আকবর। বাংলার অধিকাংশ আক্রমণ সেদিন বাঁ দিক দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন গৌতম, প্রসূন ও সুরজিৎ। প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়কে কাটিয়ে সুরজিৎ যেভাবে আকবরকে ফাঁকায় বল জুগিয়েছিলেন তার যদি অর্ধেকও আকবর কাজে লাগাতে পারতেন তাহলে বাংলা সেদিন বেশ কয়েকটি গোলে জয়লাভ করতে পারত। তবে গোয়া যেভাবে সেদিন লড়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। দলে নির্ভরযোগ্য গোলরক্ষক ব্রহ্মানন্দ শেষ মুহূর্তে অসুস্থ হওয়ায় বদলি গোলরক্ষক হিসেবে যাঁকে মাঠে হাজির করা হয়েছিল সেই খেলোয়াড় এর আগে কোনোদিন জাতীয় ফুটবলে প্রতিনিধিত্ব করেননি। তাছাড়া, গোয়ার একটি গোল রেফারী অফ-সাইডের কারণে নাকচ করে দিয়েছেন।

খেলায় সাফল্যের মূলে খেলোয়াড়দের যেমন কৃতিত্ব থাকে তেমন নেপথ্যে থাকে কর্মকর্তাদের বিশেষ ভূমিকা। ফাইনাল খেলার আগের দিন বাংলার সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ ভারতীয় ফুটবল কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, রেফারীদের সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলার বিরুদ্ধে যাচ্ছে এবং মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাংলা একটি ন্যায্য পেনাল্টি পায়নি। অভিযোগটি সত্য। কারণ, ঐ খেলার রেফারী পরে আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, ঐ ক্ষেত্রে তাঁর পেনাল্টি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু 'অ্যাডভানটেজ' দিয়ে দেওয়ার পরে আর তিনি পেনাল্টি দিতে পারেননি। বাংলার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত এবং এশিয়ান গেমস থেকে গৌতম, শ্যাম, মানস মিহির ও দিলীপ পালিতকে বাদ দেওয়ায় আই এফ এ সম্পাদক ক্ষুব্ধ। কর্মকর্তারা যে কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ রেফারী বোর্ডের চেয়ারম্যানই আই এফ এ-র সম্পাদকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, বাংলার খেলায় কোন্ রেফারীকে নিয়োগ করা হবে। তার উত্তরে বাংলা জানিয়েছিল, যে-কোনো নিরপেক্ষ রেফারীই খেলা পরিচালনা করতে পারেন।

এতে যে কাজের কাজ হয়েছে সেটা শুধু অশোকবাবু নয়, খেলোয়াড়রাও বুঝেছেন। তবে আগেই বলেছি, সেদিন আকবর যদি ঐ সহজ গোলের সুযোগগুলি নষ্ট না করতেন, তাহলে বাংলা আরও বেশি গোলে জিততে পারত।

আকবর একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করলেও তাকে কিন্তু বসানো হয়নি, কারণ স্থানীয় লোকেরা ছিলেন আকবর বলতে অজ্ঞান। ফাইনাল খেলার আগের দিন বাংলার খেলোয়াড়েরা যে হোটেলে ছিলেন সেই হোটেল এম্বাসির মালিক ত্রিলোকেশ ব্যানার্জি হঠাৎ ওপর থেকে লক্ষ করলেন যে, বেশ কয়েকজন লোক হোটেলের সিঁড়িতে মাথা ঠুকে ওপরের দিকে হাত তুলে কী যেন বলছে। ব্যানার্জি খোঁজ নিয়ে জানলেন যে,

আকবর যাতে পরের দিন আরও ভাল খেলতে পারে তার জন্য ঈশ্বরের কাছে ওরা প্রার্থনা জানাচ্ছে। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে আকবর জয়সূচক গোলটি দেওয়ার পরে আকবরকে দর্শকরা কাঁধে নিয়ে নাচানাচি করেছিলেন। দর্শকদের মন জয় করেছিলেন মানস ভট্টাচার্যও। দর্শকরা মানসের নাম দিয়েছিলেন 'রকেট'। ঠাকুর দেবতার প্রতি মানসের খুব ভক্তি। রোজ সকালে পুজো করে ফুল ফেলতেন ডাল লেকের জলে। আর ঠাকুর যে তার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন তার প্রমাণ, প্রথম ফাইনাল খেলার সুযোগেই জয়সূচক গোল করেছিলেন তিনি।

এবারের জাতীয় ফুটবলকে নেহাতই সাদামাটা পর্যায়ে ফেলা চলে। না ছিলেন নামী খেলোয়াড়, না ছিলেন ভাজ ও মেলভিন ফ্রান্সিসের মতো প্রতিষ্ঠিত রেফারীরা। এই মেলভিনের ভাই হলেন গোয়ার ফ্রান্সিস ডি সুজা। গত বছর মোহনবাগানে খেলার কথা ছিল ফ্রান্সিসের, কিন্তু ছাড়পত্রের গোলমালের জন্যে তাঁর পক্ষে কলকাতায় খেলা সম্ভব হয়নি। প্রায় এক বছর না খেলার জন্য ফ্রান্সিসের খেলায় আগের মতো গতি চোখে পড়েনি। কোচিনে প্রথম ফেডারেশন কাপে ডেম্পোর হয়ে মোহনবাগানের বিপক্ষে ফ্রান্সিস দুটি গোল করে নিজেকে নিঃসন্দেহে উঁচু দরের খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐ বছরই মোহনবাগানের তরফ থেকে ফ্রান্সিসকে কলকাতায় খেলার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আগের চেয়ে ফ্রান্সিসের দেহের ওজন কিছুটা বেড়েছে, তবু পায়ের চাতুর্যে তিনি যে এখনও যে কোনো প্রতিপক্ষের কাছে ভীতির কারণ তা এবার জাতীয় ফুটবল আসরে বারবার প্রতিপন্ন হয়েছে। একমাত্র রাজস্থান ও ফাইনালে বাংলা ছাড়া আর সব দলের বিরুদ্ধেই তিনি গোল করেছেন। ফাইনালেও তিনি গোল করেছেন, কিন্তু সে গোল নাকচ করে দেওয়া হয়।

আসন্ন এশিয়ান গেমসের প্রাক্কালে এই আসর বসানোর মূল লক্ষ ছিল যে, এর থেকে প্রাথমিকভাবে ভারতীয় দল গঠন করা হবে। যে ত্রিশ জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে দিলীপ, মিহির ও মানসের বদে পড়ার কারণ, নির্বাচকমণ্ডলীর দৃষ্টিতে তাঁরা বাংলার নিয়মিত খেলোয়াড় নন। অথচ মিহির ও মানস মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফার সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই নির্বাচকমণ্ডলী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন।

ফেডারেশন কাপ ও জাতীয় ফুটবল আসরে থেকে লক্ষ করেছি, ভারতীয় ফুটবল কর্মকর্তারা বাংলার খেলোয়াড়দের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আবার বাংলার খেলোয়াড়রাও রেফারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতী আচরণের অভিযোগ এনেছেন। দুটি অভিযোগের মধ্যে হয়ত কিছুটা সত্যি আছে, তবে ভবিষ্যৎ ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে এটি অশুভ লক্ষণ। কলকাতার খেলোয়াড় ছাড়া ভারতীয় দল গঠন যে সম্ভব নয়, কর্তৃপক্ষ তা ভালই জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মাঝেমধ্যে এমন কিছু-কিছু কাজ করে বসেন যেগুলি শুধু বিস্ময়কর নয়, নীতিবহির্ভূতও। দু' দফা সেমি-ফাইনাল খেলার পরে যদি কোনো হার-জিত না হয়, তাহলে আইনে আছে যে, টাই-ব্রেকারে খেলার ফলাফলে পৌঁছুতে হবে। বাংলা-মহারাষ্ট্রের খেলায় কিন্তু তা হয়নি। অতিরিক্ত সময় খেলানোর যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে লাভবান হওয়ার কথা মহারাষ্ট্রের, কারণ ওদের ঘরোয়া ফুটবল লীগের সময়সীমা ৯০ মিনিট। কলকাতায় ফুটবল লীগ চলে ৭০ মিনিট। দল গঠন যেভাবে করা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে গৌতমকে ইচ্ছে করেই দলে রাখা হয়নি।

এবার অবিশ্রান্ত বর্ষায় কলকাতা গেল ভেসে। বানভাসি। লোকের দুঃখ কষ্ট বাড়লো। বিশেষ করে বস্তীর লোকেদের। সকলে এগিয়ে এলেন সকলকে সাহায্য করতে। এটাই কলকাতার বিশেষত্ব।

তবে এবারকার জলমগ্ন কলকাতার চেহারাটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সমস্যাটা কত গভীর। ড্রেন, জলনিকাশী ব্যবস্থা, পাম্পিং স্টেশন, খাল কাটা এত সব করে ও কিন্তু সুরাহা হলনা। যেখানে যেখানে সি.এম.ডি.এ-র কাজ হয়েছে (টালিগঞ্জ, লেক মার্কেট, বাগবাজার, কামারপুর) সে সব জায়গায় জলজমা বন্ধ হয়নি বটে, তবে জলটা তাড়াতাড়ি সরে গেছে। বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু হয়েছে, অনেক কিছু হচ্ছে আর অনেক কিছু করা বাকী আছে। সে সব জানবার জন্য জল সংযোগ বিভাগ সি.এম.ডি.এ, কলকাতা ৭০০০১৭ তে চিঠি লেখো আর দুর্গত মানুষদের যেমন করে পার সাহায্য কর। প্রয়োজনীয় জিনিস ঠিক প্রয়োজন মত কিনবে। মজুদ কর না। দাম বাড়া আটকাও। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্য দাও।

কলকাতা শহরটা কার, আমাদের সকলের (সি.এম.ডি.এ কর্তৃক প্রচারিত)

ছবি—পরাগ রায়
বয়স—১২ বছর

ক্যাপ্টেন কালীচরণ

পুষ্পেন সরকার

এই নভেম্বরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতে আসছেন. আর তাঁদের ক্যাপ্টেন হয়ে আসছেন কালীচরণ।

কেমন ক্যাপ্টেন কালীচরণ ? তাহলে বলি শোনো।

এ বছর মার্চের প্রথম দিকে এবং মাঝামাঝি সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম দুটি টেস্টে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেয়। প্রথম টেস্টে এক ইনিংস ও ১০৬ রানে এবং দ্বিতীয় টেস্টে ৯ উইকেটে জিততে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তেমন মাথা ঘামাতে হয়নি। এই দুটি টেস্টেই কেরি প্যাকারের দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা যোগ দেওয়ায় পূর্ণ শক্তি নিয়েই ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

এরপরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড ও অধিনায়ক লয়েডের মধ্যে কিছু মতান্তর হওয়ায় লয়েড এবং কেরি প্যাকারের দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা পরের তিনটি টেস্টে খেলেননি। হেনস, রিচার্ডস, লয়েডের মতো কুশলী ব্যাটসম্যান; অ্যান্ডি রবার্টস, কলিন ক্রফ্‌ট ও জোয়েল গার্নারের মতো ফাস্ট বোলার এবং ডি এল মারের মতো দক্ষ উইকেটরক্ষক দল থেকে বাদ পড়ে যান।

এমন এক অবস্থার মধ্যে কালীচরণের উপর বাকি তিনটি টেস্টে দেশের ক্রিকেট সম্মান বাঁচানোর দায়িত্ব এসে পড়ে। কালীচরণ অধিনায়ক হন। অধিকাংশ নতুন খেলোয়াড় নিয়ে তাঁকে তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখীন হতে হয়। অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে জয়লাভ করে। প্রথম দুটি টেস্টে বিরাট সাফল্যের পর অধিনায়কত্বের নতুন দায়িত্ব নিয়ে প্রথম পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়ায় তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন কালীচরণ, দেশের ক্রিকেট-সম্মান কিছুতেই ম্লান হতে দেব না। চতুর্থ টেস্টের আগে দলের সব খেলোয়াড়কে কাছে ডেকে সাহস দেন। বলেন, "যাঁরা জাতির ক্রিকেট-সম্মানের চাইতে অর্থ এবং অন্যান্য বিষয়কে বড় করে দেখেন, তাঁদের অনুপস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট-সম্মান আমরা কিছুতেই মলিন হতে দেব না।"

চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে দলের সব থেকে বেশি রানের (৯২) একটা ঝকঝকে ইনিংস খেলে উদ্বুদ্ধ করেন তরুণ খেলোয়াড়দের।

পরিত্যক্ত পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আর একটি ১২৬ রানের স্মরণীয় ইনিংস উপহার দিয়ে কালীচরণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন নিজের যোগ্যতা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে আটটি ইনিংসে তাঁর সংগৃহীত রান সংখ্যা ছিল ৪০৮। প্রথম ও পঞ্চম দুটি টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি, রানের গড় হিসাব ৫১। এর পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড নিশ্চিন্তে ভারত-সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়কের দায়িত্ব কালীচরণের হাতে তুলে দেয়।

১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে সরকারিভাবে টেস্ট খেলা শুরু হয়েছে। ভারতে ১৮টি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১৯টি নিয়ে মোট ৮টি সিরিজে ৩৭টি টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭টি এবং ভারত চারটিতে জয়ী হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টির মীমাংসা হয়নি। এ পর্যন্ত চারবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারত সফরে এসেছে। সেই চারবারের অধিনায়ক ছিলেন গডার্ড, আলেকজান্ডার, সোবার্স ও লয়েড। পঞ্চম সফরের অধিনায়ক হিসাবে আসছেন কালীচরণ। কেরি প্যাকারের দলে যোগ দেওয়ার চুক্তিতে তিনিও প্রথমে সই করেছিলেন। কিন্তু অর্থের চাইতে জাতীয় ক্রিকেটের সেবা বড় মনে হওয়ায়, সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন।

লয়েডের নেতৃত্বে ১৯৭৪-৭৫ সালে কালীচরণ ভারত সফরে এসেছিলেন। অধিনায়ক হিসাবে ভারতে আসতে পেরে তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন। তবে এবারে তাঁর দায়িত্বও অনেক বেশি। একটা প্রায় আনকোরা নতুন দল নিয়ে তাঁকে আসতে হচ্ছে। তিনি ছাড়া ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা এই দলের মাত্র দুজন খেলোয়াড়ের আছে। ফাস্ট বোলার, ভ্যানবার্ন হোল্ডার ও উইকেটরক্ষক ডেভিড মারে। মারে গত সফরে দলের সঙ্গে এলেও কোনো টেস্টে খেলেননি। ফলে আগের চারটি ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের চাইতে এবারের কালীচরণের দল কিছুটা অনভিজ্ঞ বললে ভুল বলা হবে না।

বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সেরা ব্যাটসম্যান কালীচরণ। বয়স ২৯। পুরো নাম আলভিন কালীচরণ। বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। মারে চোস্ত হাত। যে কোন বোলারকে মোকাবিলা করতে পারেন। হাসি-খুশিতে ভরা ছোটখাটো মানুষ। দেখলে মনে হয় ভারতেরই একজন। ১৯৭১-৭২ জর্জটাউনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্টে ১০০ রানে অপরাজিত থেকে তিনি দেশে আলোড়ন তোলেন।

১৯৭৪-৭৫ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারতে প্রথম টেস্ট হয়েছিল বাঙ্গালোরে। প্রথম ইনিংসে দলের ২৮৯ রানের মধ্যে কালীচরণের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল সর্বাধিক ১২৪। দুটি ওভার বাউন্ডারি ও পনেরোটি বাউন্ডারি সহ তাঁর এই ইনিংসের বিক্রম দেখে দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। স্পিনারদের অনুকূল বাঙ্গালোর উইকেটে প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর এবং বেঙ্কটরাঘবনের মতো বিশ্বের তিন নামী স্পিনার কালীচরণকে এতটুকু চিন্তিত করতে পারেননি।

শুধু ভারতের বিরুদ্ধে কালীচরণ ব্যাটিংয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন ভাবলে ভুল করা হবে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও তাঁর সেঞ্চুরি সহ অনেক গৌরব করার মতো ইনিংস আছে। এ পর্যন্ত ৪৫টি টেস্টে ১০টি সেঞ্চুরি নিয়ে কালীচরণের সংগ্রহ ৩,৩৩১ রান। এ ছাড়া শতরানের কাছাকাছি পৌঁছে সেঞ্চুরির গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সাতবার। তাঁর ব্যাটিংয়ে রোহন কানহাইয়ের ছাপ আছে। দুজনেই গায়েনার খেলোয়াড়। একই সঙ্গে বহু খেলা খেলেছেন। কালীচরণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ব্যাটিংয়ের অনেক কিছু শিখেছেন কানহাইয়ের কাছ থেকে। কানহাই 'আমার গুরু'।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেরা

সুব্রত সরকার

করাচিতে ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্ট শেষ হওয়ার সপ্তাহ দুই-এক বাদেই আরম্ভ হয়ে যাবে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজ। তবে পাকিস্তান-ভারত ম্যাচগুলি যেমন দুটি দেশের জাতীয় দলের মধ্যে খেলা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-ভারত টেস্টকে ঠিক সেইভাবে বর্ণনা করা যায় না। কারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তো একটি দেশ নয় ঃ ওই দল গঠিত হয় চারটি স্বাধীন রাজ্যের প্লেয়ার নিয়ে আর এতগুলি ক্ষুদ্র ব্রিটিশ কলোনির খেলোয়াড়েরাও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের আয়ত্তে পড়ে।

ভারতীয় দল পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরবার আগেই অ্যালভিন কালীচরণের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টীম এদেশে খেলতে আরম্ভ করবে। কালীচরণ আর দলের ম্যানেজার জো সলোমানের মতন এই টীমের আরও দুজন প্লেয়ার গায়নার লোক; তিনজন সদস্য জামাইকার নাগরিক, পাঁচজনের দেশ বার্বাডোস ; তিনজন প্লেয়ার ত্রিনিদাদ থেকে, আর বাকি দুইজন যথাক্রমে নেভিস আর ডোমিনিকা দ্বীপের বাসিন্দা।

ক্যারিবিয়ানের যেখানে-যেখানে ক্রিকেট খেলা হয়, সেই দ্বীপগুলির মধ্যে জামাইকাই সব থেকে বড়। কিউবার ঠিক দক্ষিণে হচ্ছে জামাইকা. আর ১৯৬২-তে স্বাধীন হওয়া এই দেশের রাজধানী কিংস্টন হচ্ছে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯২৮-এর ইংলিশ মরশুমে যেবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের প্রথম টেস্ট সিরিজে নামে, তখন দলের অধিনায়ক ছিলেন জামাইকারই এক প্লেয়ার- কার্ল নীউনস্। ভারত ভ্রমণকারী দ্বিতীয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টীমের (১৯৫৮-৫৯) ক্যাপ্টেন আর গত সফরের (১৯৭৪-৭৫) ম্যানেজার জেরি অ্যালেক্সাণ্ডারও জামাইকান। তবে আজ অবধি ওই দেশ থেকে যত প্লেয়ার বিশ্ব ক্রিকেটে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সব থেকে নাম বেশি জর্জ হেডলীর। ত্রিশ বছর আগে যখন এই "ব্ল্যাক ব্রাডম্যান" ভারত সফরে আসেন তখন তিনি খেলার জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে. তবে এক সময়ে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের অন্যতম ছিলেন। ২২টি টেস্টে. তিনি রান করেন ২,১৯০ গড় ৬০·৮ ঃ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুবার তিনি ম্যাচের দুটি ইনিংসেই শত রান করেন।

জামাইকার প্রায় ১,০৫০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ দিকে দুটি দ্বীপ মিলিয়ে ত্রিনিদাদ অ্যাণ্ড টোবাগো রাজ্য। তবে ১৯৬২'তে স্বাধীন হওয়া এই দেশের ক্রিকেট সবটাই ত্রিনিদাদের। রাজধানী পোর্ট অফ স্পেনও সেখানে। ত্রিনিদাদের প্রায় ৩৫ শতাংশ লোক মূলত ভারতীয় তাই সেখানকার ক্রিকেট প্লেয়ারদের কয়েকজনের নামেও যথেষ্ট ভারতীয়-ভাব ঃ রফিক

লিয়ারি কনস্টান্টাইন

'ব্ল্যাক ব্রাডম্যান' জর্জ হেডলী

জুমাদীন, চরণ সিং, স্যানি রামাধীন। তবে ত্রিনিদাদের ক্রিকেটারদের মধ্যে লিয়ারি কনস্টান্টাইন-ই সবচেয়ে নাম করা। ১৮টি টেস্টে তাঁর রেকর্ড তেমন কিছু না হলেও তিনি ছিলেন অসাধারণ এক অল-রাউন্ডার ঃ দারুণ ফাস্ট বোলার, খুব দ্রুত-রানকারী ব্যাটসম্যান, মারাত্মক ফীল্ডার। লর্ড কনস্টান্টাইন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে কখনও এদেশে আসেননি বটে, তবে ১৯৩৪-এর পরের দিকে তিনি ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের আমন্ত্রণে ভারতে কয়েক সপ্তাহ কাটান, আর হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত মৈন-উদ-দৌলা গোল্ড কাপ টুর্নামেণ্টে খেলেন।

ত্রিনিদাদের ১৫০ মাইল উত্তরে বার্বাডোস। মাত্র ১৬৬ বর্গ মাইল আয়তনের এই ছোট্ট দ্বীপটি স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬৬-তে দেশের রাজধানী ব্রিজটাউন। সেই দেশের সব থেকে মূল্যবান উৎপাদন হল চিনি আর ক্রিকেট প্লেয়ার। ত্রিশ বছর আগের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের বিশ্ববিখ্যাত তিনজন "ডবলিউ"—এভার্টন উইকস, ক্লাইড ওয়ালকট, সার ফ্রাঙ্ক ওয়ারেল সবাই বার্বাডোসের খেলোয়াড়। পরেও ওদেশ থেকে বহু ক্রিকেটার পৃথিবীময় নাম করেছেন, যেমন ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল, তবে জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানে আছেন সার গারফীল্ড সোবার্স। অদ্বিতীয় এই ন্যাটা অল-রাউন্ডার দুটি টেস্ট সমেত আমাদের কলকাতায় মোট চারবার খেলে গেছেন।

গায়না আবার ত্রিনিদাদের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। তবে সেটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের একটি নয়, দক্ষিণ আমেরিকা উপমহাদেশের উত্তরের এক অঞ্চল। ১৯৬৬ তে স্বাধীন হওয়ার আগে নাম ছিল ব্রিটিশ গায়ানা। রাজধানী জর্জটাউন, নাগরিকদের শতকরা ৪৫ ভাগের পূর্ব পুরুষরা ভারতের লোক ছিলেন। তাই কালীচরণ, শিবনারায়ণ, কানহাই প্রভৃতি নামের ক্রিকেটার সেখান থেকে বেরিয়েছেন। রোহন কানহাই বা ক্লাইভ লয়েডের মতো ব্যাটসম্যান সেখানে তৈরি হলেও নানা নদীর দেশ গায়নার ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হয়তো অফ-স্পিনার লান্স গিবস—৩০৯ টেস্ট উইকেটের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। গিবস তিনবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে এদেশে আসা ছাড়াও ১৪ বছর আগে মোহনবাগান ক্লাবের প্লাটিনাম জুবিলিতে অংশ গ্রহণ করতে আসেন।

আণ্ডি রবার্টস বা ভিভিয়ান রিচার্ডস, কেউই কিন্তু এই চারটি দেশের প্লেয়ার নন ঃ তাঁরা হলেন লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ডস্ গ্রুপের অ্যাণ্টিগুয়া দ্বীপের লোক। বার্বাডোসের কিছুটা পশ্চিমে উইণ্ডওয়ার্ড আইল্যাণ্ডস্, আর তার উত্তরেই লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ডস্। এইসব দ্বীপ সরকারীভাবে ব্রিটিশদের অধীনে থাকলেও অনেক দিক দিয়েই প্রায়-স্বাধীন। এখন অবধি লীওয়ার্ড আর উইণ্ডওয়ার্ড গ্রুপের থেকে চারজন করে প্লেয়ার টেস্টে নেমেছেন। অ্যাণ্টিগুয়া আর নেভিসই উইণ্ডওয়ার্ড গ্রুপের প্রধান দ্বীপ ; আর দক্ষিণের দ্বীপগুলির মধ্যে ডেমিনিকা ছাড়া সেণ্ট লুসিয়া আর ভিনসেণ্টের নাম করা যায়।

এর থেকেই বোঝা যায়, খালি ক্রিকেটের দিক থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে এক বলা চলে। আর নানা দেশের ক্রিকেটারদের একটি দলে সংহত করা সহজ কথা নয়।

ফ্রাঙ্ক ওয়ারেল

গারফীল্ড সোবার্স

ভারত-পাক প্রথম টেস্ট

অশোক দাশগুপ্ত

"প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলেরই প্রধান লক্ষ ছিল যেন তেন প্রকারেণ হার বাঁচিয়ে জাতীয় সম্মান বজায় রাখা। জেতার জন্য ঝুঁকি নেওয়ার প্রশ্নই ছিল না।"

সুনীল গাভাসকর (প্রথম টেস্ট, প্রথম ইনিংস—৮৯)

জাভেদ মিয়াঁদাদ (প্রথম টেস্ট, প্রথম ইনিংস—অপরাজিত ১৫৪)

ক্রিকেটের বাইবেল উইজডেন এইরকম লিখেছিল উনিশশো ষাট-একষট্টির ভারত-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজের পর। মনে হচ্ছে, উনিশশো উনআশির উইজডেনেও অন্য কিছু লেখার দরকার হবে না, রান এবং উইকেটের হিসেবগুলো ছাড়া।

লালা অমরনাথ বলেছিলেন, এই পিচে পেস বোলাররা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। ওদিকে পাকিস্তানি নির্বাচক ওয়াকিশ ম্যাথিয়াস বলেছিলেন, শেষের দিকে স্পিনারদের অনুকূলে পিচ ভাঙতে পারে। পিচ ভাঙেনি। ভেঙেছে বোলারদের কপাল আর এক ঝাঁক রেকর্ড।

এক সময়ে পাকিস্তানি ক্রিকেট-লেখকরা কেন জাহিরকে ব্যারি রিচার্ডসের প্রায় সমকক্ষ বলে দাবি করেছিলেন, তা বোঝা গেল প্রথম দিনেই। যথেচ্ছ পিটিয়েছেন; যখন পেটাননি, মনে হয়েছে স্বেচ্ছায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, পরবর্তী আক্রমণের জন্য। বিশ্বনাথ একটা বল ধরে ক্যাচ নেবার ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠতেই জাহির আব্বাসও ভান করলেন, যেন প্যাভিলিয়নে ফিরছেন।

নতুন বলের পালিশ খসিয়েই যথারীতি বিদায় নিয়েছিলেন দুই পেস বোলার। কিন্তু বেদী ছাড়া কেউই তেমন কিছু ভাবাননি। চুরাশি থেকে একশো দশ—এই ছাব্বিশ রানের মধ্যে তিনটে উইকেট পড়ে যাওয়ায় গাভাসকার আর বেদীর মধ্যে সে কী শলা-পরামর্শ! কিন্তু জাহিরের সঙ্গে তখন জাভেদ মিয়াঁদাদ—মাথার ওপর বল তুলে দিতে যিনি বড্ড ভালবাসেন। প্রথম দিকে তিনি স্পিনারদের বিরুদ্ধে একটু অপ্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রসন্নর বল লং অনের ওপর দিয়ে সামিয়ানার মাথায় ফেলতেই বোঝা গেল এ-ছেলে তৈরি।

তিন উইকেটে দুশো তিরাশি রানে পাকিস্তান প্রথম দিন শেষ করতেই বেদী সাহেবের চিন্তা হল একটাই : এই ম্যাচ ড্র করা যাবে তো!

দ্বিতীয় দিনে মোট রান উঠল দুশো চুরাশি। জাহির আব্বাসের ১৭৬ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। জাহির এবং জাভেদের চতুর্থ উইকেটে তোলা ২৫৫, দুই দেশের টেস্ট ইতিহাসে নতুন রেকর্ড।

খেলাটি কিন্তু এই দিনই প্রায় মরে গেল। প্রায়—কারণ, কারও-কারও আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তৃতীয় দিন ভারতীয় ইনিংসে হঠাৎ ভাঙন ধরাতে পারে সকাল বেলার ইমরান-সরফরাজ।

সে গুড়ে তিনশো ছেচল্লিশ মিনিট ধরে বালি দিলেন সানি গাভাসকর। ৮৯ রান উপলক্ষ মাত্র।

ইফ সানি শাইনস, ক্যান বিশ্বনাথ বি ফার বিহাইন্ড? বিশ্বনাথের ১৪৫ সৌন্দর্যের বিচারে জাহিরের ইনিংসকে ছাড়িয়ে গেল। চতুর্থ দিন সকালে ইমরানের বলে যে আলতো করে কাট করলেন, তা একমাত্র বিশ্বনাথের ব্যাট থেকেই আসতে পারে। এ তো কাট নয়—ছোঁয়া, আদর করে ঠেলে দেওয়া!

বেঙ্গসরকারের ৮৩ সযত্নে রচিত, কিন্তু একশো এবং তিরাশির মধ্যে ব্যবধান সতেরোর চেয়ে অনেক বেশি।

মরা পিচের খেলা গড়াতে গড়াতে হঠাৎ প্রাণবন্ত হল শেষ দিন জাহির আর আসিফ ইকবালের মারমুখী ব্যাটিংয়ে। উৎসবের ফানুস ওড়াতে বল হাতে নিলেন গাভাসকর আর সুরিন্দর অমরনাথ। খেলাটিকে আরও হালকা করে দেওয়ার জন্য ওঁদের দুজনকে পেতে হল জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেট।

নির্দিষ্ট সময়ের আট ঘণ্টা আগেই খেলা থামানোর নায়ক আমাদের খুদে ওস্তাদ। যেন এই নিষ্প্রাণ পিচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই ভাল মন্দ সব বলই কপট সতর্কতায় পিচেই মিশিয়ে দিলেন গাভাসকর। বক্তব্য বোধহয় একটাই : পিচ কত নিষ্প্রাণ করবে? আমি জানি, প্রয়োজনে কী করে আরও নিষ্প্রাণ ক্রিকেট খেলতে হয়।

মধ্যমগ্রাম স্কুল কি পারবে ?

বজ্রসেন

একটু চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে। আনন্দেও। বোধহয় এই রকম অনুভূতিকেই ইংরেজিতে বলা হয় 'প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ'। খেলার মাঠে এইরকম একটা দৃশ্য দেখব বলে প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ আজ পর্যন্ত কখনও দেখিনি বিজিত দল রানার্স-আপ ট্রফি নিয়ে ফিরছে। ভাবছিলাম, দলের উপর কতখানি মমতা থাকলে এ-কান্না আসে! শুধু তাই নয়, বিজয়ী, বিজিত দু'দলের ছেলেরাই প্রণাম করল পরিচালনা কমিটির কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের—সকলেই গুরুজন। কেউ কেউ গুরু।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, ডাঃ বি সি রায় শীল্ডের ফাইনাল নিয়ে লিখছি। জোর লড়াই করেও পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন হেরে গেল। জিতল মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল। গতবারও এই দুটি স্কুলই ফাইনাল খেলেছিল—খেলায় পাইকপাড়া জিতলেও পরে স্ক্র্যাচড্ হয়ে যায়, বিজয়ী ঘোষিত হয়েছিল মধ্যমগ্রাম স্কুল। এ-বারের ফাইনালে যে-কেউই জিততে পারত। পুরো সময় গোলশূন্য। অতিরিক্তও তাই। টাইব্রেকারের পাঁচটি পেনাল্টিতে দু'দলই গোল করল তিনটি করে। এরপর হকির মতো 'সাডেন ডেথ পিরিয়ডের' পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দিলেন রেফারী। তাতে মধ্যমগ্রাম গোল করামাত্রই খেলা শেষ। পুরস্কার দেওয়ার সময় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শম্ভু ঘোষ ঠিকই বলেছিলেন, দুটি দলই দিল্লি যাওয়ার মতো খেলা খেলেছে।

স্বর্গত এয়ার-মার্শাল সুব্রত মুখার্জির স্মৃতিরক্ষার জন্যে ১৯৬১ থেকে নতুন দিল্লির ডুরাণ্ড ফুটবল কমিটি সুব্রত মুখার্জি কাপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন। সংক্ষেপে, সুব্রত কাপ বা 'লিটল ডুরাণ্ড'। এই আন্তঃরাজ্য স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা। কোন্ রাজ্য থেকে কোন্ স্কুল এই প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে তা স্থির করার জন্যে প্রত্যেক রাজ্যেই প্রাথমিক প্রতিযোগিতা চলে। রাজ্যস্তরের প্রতিযোগী কীভাবে ঠিক হয়? স্থানীয়, মহকুমা, জেলা ও অঞ্চল—এই ক্রম অনুযায়ী প্রতিযোগিতা চালানো হয়। পশ্চিম-বাংলায় রাজ্য চ্যাম্পিয়ন সুব্রত কাপ খেলতে যাওয়ার যোগ্যতার সঙ্গে বাড়তি পাওনা পায় সুদৃশ্য বি সি রায় শীল্ড। রানার্সরা পায় কালিপদ মুখার্জি কাপ। এ বছর বি সি রায় শীল্ডের সেমিফাইনাল দুটি ও ফাইনাল খেলা হল চুঁচুড়ায়। কলকাতার বাইরে এই প্রথম। ডেপুটি ডি পি আই (শারীরশিক্ষা) ধনপতি চন্দ্র জানালেন যে, মফস্বলে উৎসাহ সঞ্চার করার জন্যে এবং নতুন প্রতিভার সন্ধানের জন্যে মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে খেলানোর সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন। শেষের কারণটির গুরুত্ব খুবই। অনেকেই এখন ভুলে গেছেন, কিন্তু কথাটা সত্যি যে, সুভাষ ভৌমিক, প্রণব গাঙ্গুলি, সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার, সীতেশ দাশ ও দিলীপ পালিতের মতো খেলোয়াড়রা প্রথমে এই প্রতিযোগিতায় খেলেই দর্শক-মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন।

পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ এবার সুব্রত কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না, তবে বি সি রায় শীল্ডে ও সুব্রত কাপ, দু'টি প্রতিযোগিতাতেই ওদের রেকর্ড সবচেয়ে ভাল। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত যে ১৭ বার বি সি রায় শীল্ডের খেলা হয়েছে ('৬৫তে হয়নি) তার মধ্যে তারা বিজয়ী হয়েছে চারবার। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সুব্রত কাপও জিতেছে চারবার—১৯৬৮, ১৯৭২, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে। ১৯৭১ সালে সুব্রত কাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি ; হলে সেবারের বি সি রায় শীল্ড বিজয়ী কুমার আশুতোষ আরও একবার সুব্রত কাপ জেতার সুযোগ পেত। তেমনি ১৯৭৪ সালে ওরা রাজ্যস্তরে ফাইনালে না উঠেও শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে খেলার সুযোগ পেয়ে যায় এবং জেতে। যে স্কুল সুব্রত কাপ জেতে, তারা পরের বার রাজ্যস্তরে না খেলে সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পায়।

আর কিছুদিন পরেই দিল্লিতে সুব্রত কাপ প্রতিযোগিতার খেলা শুরু হচ্ছে। গোটা পশ্চিমবাংলার দৃষ্টি এখন একটি দলের উপরই নিবদ্ধ। বলা বাহুল্য, তারা হল ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল। গত বছর তারা দিল্লি থেকে শূন্য হাতে ফিরে এসেছিল। দেখা যাক্, এবার কী হয়!

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর। আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিত করতে আমাদের যে-কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

ছোটরা সবাই এসো আমাদের রিচি রোড ও গড়িয়া শাখায় তোমাদের

চিলড্রেন্‌স কাউন্টার-এ

- নিজের নামে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলো, পাশবই নাও।
- নিজের নামে টাকা জমা দাও, নিজের সইতে টাকা তোলো।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১
হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান : জে এন বিশ্বাস

Progressive/UIB-/78

তোপচাঁচি

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

সকাল-বিকেল তোপচাঁচি,
সন্ধে-দুপুর দুধ চাঁছি,
খাচ্ছি বেদম, শুচ্ছি খুব,
পেটের মধ্যে ভরদুপুর।

দুপুর দুপুর সন্ধে কি,
এখন আমি বন দেখি,
চলতে বলো যাচ্ছি না,
তোপচাঁচিও পাচ্ছি না।

ভাবছ বসে ভাবটা কী,
মুণ্ডু সাদা-সাপ্‌টা কি,
পাগ্‌লা মনের চাপটা কি
আনছে চোখে ভরদুপুর।

দুপুর দুপুর পুকুরজল
টলমলাল পদ্মদল।
পদ্মদলের ভাবনা কী,
যাচ্ছি আমি তোপচাঁচি।

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

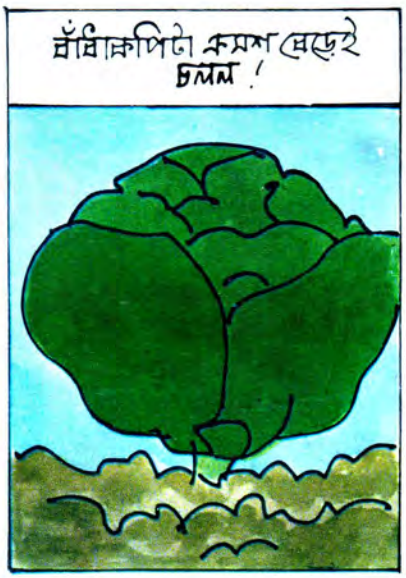

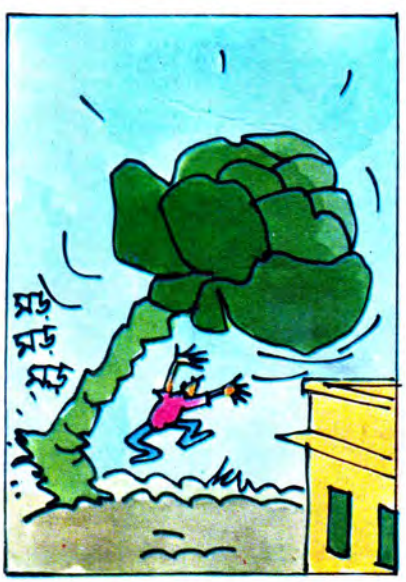

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার আঁকো একটানা বাঁশগাছ। যেমন মোটা গাছ আঁকতে চাও, সেই মাপে প্যাস্টেলের টুকরো নিয়ে আড়াআড়িভাবে চাপ দিয়ে টান দাও। কেবল গাঁট যেখানে পড়বে সেখানে সামান্য তুলে নিয়ে আবার গাঁটের জন্যে সামান্য দাগ দিয়ে একইভাবে টেনে গোড়ায় শেষ করো। প্যাস্টেলের কাঠি লম্বালম্বিভাবে ধরে একটু চাপ দিয়ে গোল করে ঘুরিয়ে দিলেই গাঁটের দাগ পাবে। পাতার জন্যে দাও আড়াআড়িভাবে তেরছা টান। এইভাবে করতে থাকলেই বাঁশ গাছ ছাড়াও অন্যগাছ পাবে।

কারিগর

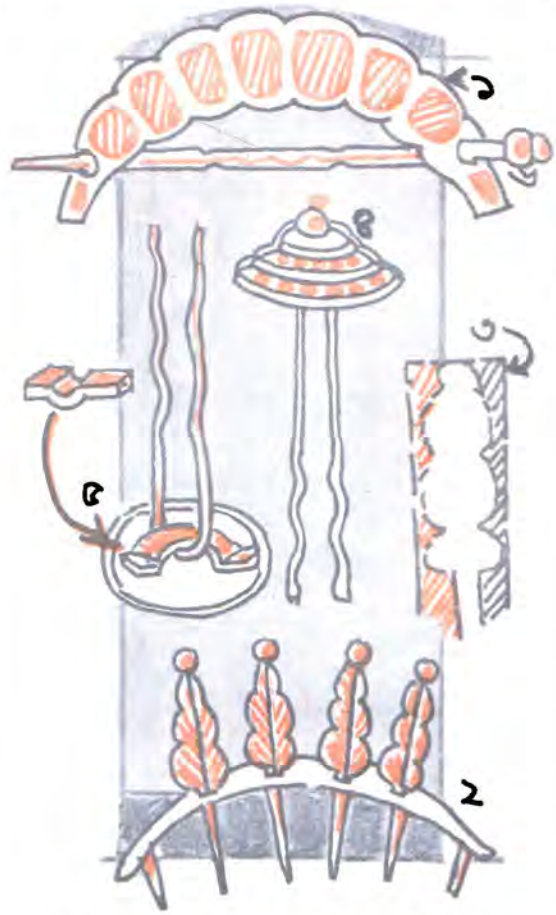

বাঁশের কাজ, মাথার সাজ

বাঁশের চুড়ি করেছ, এবার মাথার ক্লিপ আর কাঁটার জন্যে যা যোগাড় করেছ তার সঙ্গে মাথায় গোঁজার সাধারণ কাঁটা যোগ করে শুরু করো। যেমন মাপের ক্লিপ চাও (১নং ছবি) সেই মাপ মতো চাকা চাকা করে বাঁশ কেটে কম-বেশি করে দু টুকরো করে, যে অংশটা বেশি সেই অংশকেই নিজের পছন্দ মতো আকার দিয়ে নাও। এবার এদিকে মাথায় আটকাবার জন্যে দু পাশের শেষ দিকে দুটো ফুটো করো আর সেই ফুটোয় আটকাতে পারে এমন একটা নকশাকারী কাঠি তৈরি করো যার একদিকে অন্যদিকের থেকে সরু হবে (৬ নং ছবি)। কাজ শেষ হলে ক্রাইলিন রঙ দিয়ে নকশা কাটতে পারো বা নানান রঙের পুঁতি দিয়ে সাজালেও সুন্দর হবে। ২ নং ছবির মতো মাথার কাঁটা করতে গেলে প্রথমটির মতোই বাঁশ কেটে তার মাথায় যে কটা সাজ বসাতে চাও, সেই মাফিক ফুটো করে তার সাজ তৈরি করার জন্যে (৩নং ছবি) বাঁশের পাতি করে নকশা কেটে নাও। দরকার হলে মাথায় রঙিন পুঁতি বসিয়ে দিলে দেখতে সুন্দর হবে।

মাথার গোল কাঁটা করার জন্যে মাপ-মতো গোল বা চৌকো টুকরো কেটে নাও, আর তা চুড়ো করার জন্যে (৪নং ছবি) পর-পর মাপের টুকরো ফেভিকল দিয়ে জোড়ার পর তা উলটে নিয়ে মাথার কাঁটা লাগিয়ে নাও ঠিক ৫নং ছবির মতো করে।

যখন খুশি মুখে দিন মজার মিষ্টি নিউট্রিন

নিউট্রিন-এর
সুইট ও টফি

হ্যাঁ, এই তো সেই খাসা মিল্টি, যা বছরের পর বছর ধরে
ভারতের অন্যান্য সব শহরে বাচ্চাদের মন কেড়ে নিয়েছে।
এবার সেই মিল্টি এই শহরেও হাজির...
বাচ্চাদের মুখে সারাদিন 'চাকুম-চুকুম' চলতেই থাকবে।
আজই কিছু নিউট্রিন মুখে দিন, এরপর তফাৎটা শুধু বুঝুন।

nutrine

চাকুম-চুকুম খাসা
মিষ্টি দিয়ে ঠাসা

নিউট্রিন কনফেকশনারী কোম্পানি লিমিটেড
প্যালামানের রোড
চিত্তুর ৫৭১ ০০২, অন্ধ্র প্রদেশ

CAS/NC-20/78 BEN

আনন্দমেলা। নভেম্বর ১৯৭৮। দেড় টাকা
ANANDAMELA Regd. No. WB|CC 264

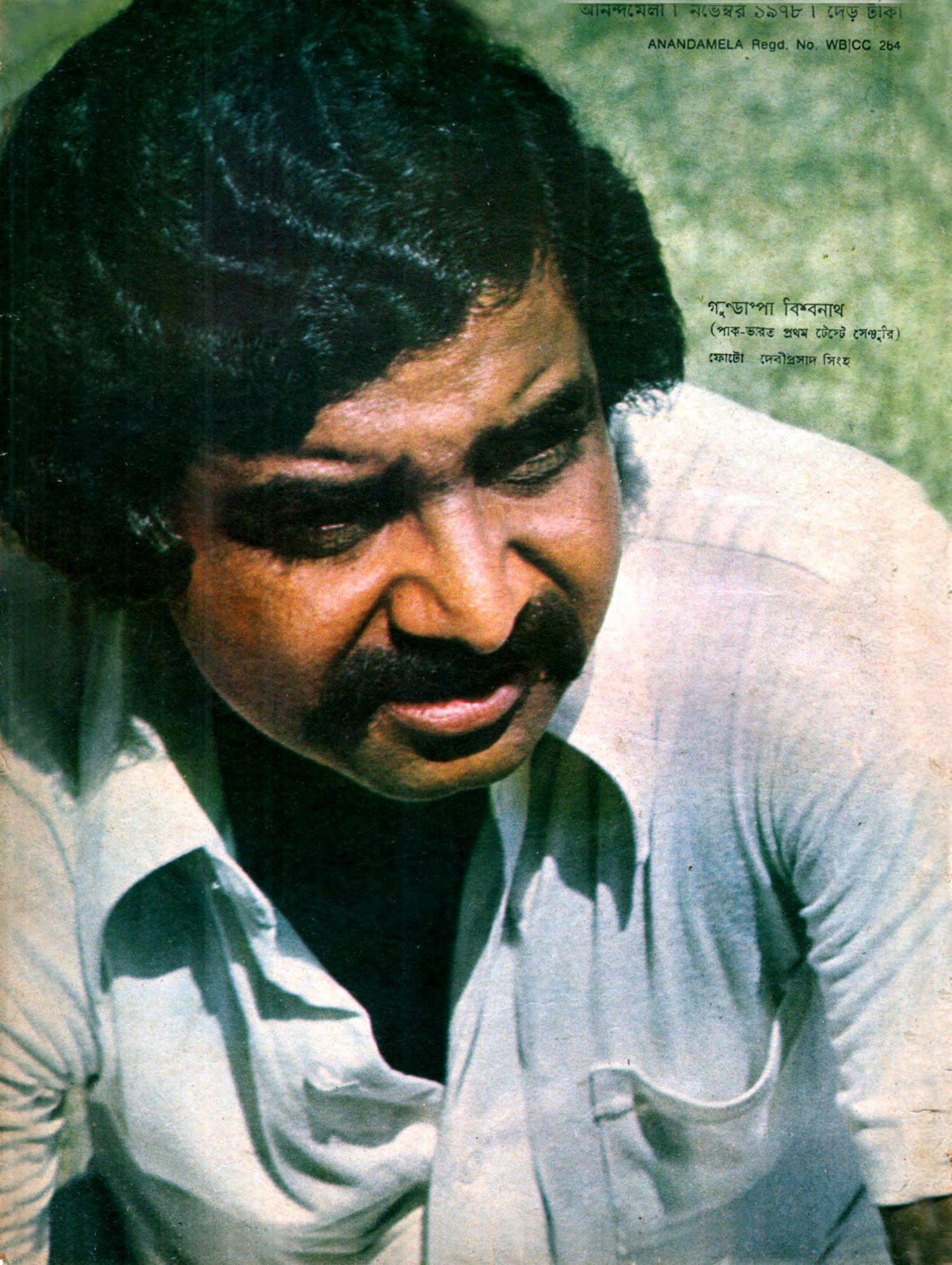

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ
(পাক-ভারত প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি)
ফোটো দেবীপ্রসাদ সিংহ